ফসর
য়র বেসেইনে
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

প্রফেসর পিয়ের বেসেইনে এম.এ.ডি-লিট্

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি

অনুবাদ

অধ্যাপিকা সুফিয়া খান

মানবিক বিভাগ

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন বাংলা একাডেমীর মূল লক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনেও একাডেমী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মননশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অবদান দেশ বিদেশের বিদ্বৎ সমাজে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশনার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের অধিক। এই বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার মধ্যে এমন কিছু বই আছে যা ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রণীত ও প্রকাশিত হয় নি। শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হওয়ায় বাংলা একাডেমীর অনেক বই দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কিছু বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। এই অভিলক্ষে ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রণযোগ্য গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব একাডেমীর 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্পে'র অধীনে সম্পন্ন হয়ে আসছে।

প্রফেসর পিয়ের বেসেইনে প্রণীত *'Tribesmen of Chittagong Hill Tracts'* গ্রন্থটি অধ্যাপিকা সুফিয়া খান 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি' নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। লেখক এই গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া উপজাতিদের সামাজিক জীবন-যাপন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। বাংলায় অনূদিত এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

এই গ্রন্থ আগেরমতো পাঠকসমাজের চাহিদা পূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

Tribesmen of Chittagong Hill Tracts বইটি ১৯৫৭-৫৮ সালে লেখা হয়। Prof Pierre Bessaignet (প্রফেসর পিয়ের বেসেইনে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্রদের কাছে স্থানীয় উপজাতি ও সমাজ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক ধারণা দেবার মানসে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) দক্ষিণ-পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) এক নৃতাত্ত্বিক জরিপ কাজ পরিচালনা করেন। সেই সময়ে পার্বত্য অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্গম ও বন্ধুর। তাছাড়া একজন বিদেশীর (French man) নিকট ভাষার প্রতিবন্ধকতা তো ছিলই। তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড আগ্রহ, নিষ্ঠা, আন্তরিক দরদ ও ধৈর্য্য দিয়ে এ সমস্ত প্রতিকূলতা তিনি অতিক্রম করে অতি স্বল্প সময়ে ছাত্রদের পড়ানোর জন্য কিছু উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক উপাদান সংগ্রহ করে ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের দেশ/সমাজ ও উপজাতিদের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক ধারণা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন।

১৯৫৮ সালে নৃতত্ত্বের ক্লাশে তিনি তাঁর manuscript থেকেই পড়াতেন। পরবর্তী পর্যায়ে এটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সম্পর্কে জানা যেমন প্রয়োজন তৎসঙ্গে এই উপজাতিদের আবাসস্থলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা থাকা ও জানা সম প্রয়োজন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বরাবর উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত যে পার্বত্যভূমি রয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পরিচিত। বৃটিশ আমলে প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনিকভাবে চট্টগ্রাম জেলারই অংশ ছিল। ১৮৬০ সালের আগে পর্যন্ত বৃটিশ সরকার সরাসরি পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করে নাই। ১৮৬০ সালে পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলা থেকে স্বতন্ত্র করে Superintendent of Hill Tribes পদবী নামধারী একজন অফিসারকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শান্তিরক্ষা ও উপজাতিদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যপরিধি বিস্তৃত করে বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে Superintendent of Hill Tribes পদবী পরিবর্তন করে "ডেপুটি কমিশনার" করা হয়। ক্যাপ্টেন T. H. Lewin ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ডেপুটি কমিশনার।

বৃটিশ ভারতে এই জেলার আয়তন ছিল ৬৮৮২ বর্গমাইল[১] (সীমান্ত কমিশন রিপোর্ট মার্চ ১৮৭৫), পাকিস্তান আমলের ১৯৫১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে আয়তন দেখা যায়

---

১. Hunter *"Statistical Account of the Chittagong Hill Tracts"* vol VI. Page 17,. Trubner and Co London 1876.

৫১৩৮ বর্গমাইল, আর ১৯৬১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে দেখা যায় ৫০৯৩ বর্গমাইল আর বাংলাদেশে ১৯৮১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে এর আয়তন ৫০৮৯ বর্গমাইল।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত সেহেতু প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য Bengal Government ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই বিস্তৃত পার্বত্যভূমিকে তিনটি সার্কেল যথা, চাকমা সার্কেল, বোমং সার্কেল ও মং সার্কেলে বিভক্ত করে প্রত্যেক সার্কেলের জন্য একজন রাজা বা প্রধান নিযুক্ত করেন। ম্যাপে সার্কেলগুলির অবস্থান দেখানো হয়েছে।[২]

বৃটিশ শাসন আমলে ও পাকিস্তান শাসন আমলে, পরিলক্ষিত হয় যে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর পাশাপাশি পাহাড়িয়াদের নিজস্ব উপজাতীয় প্রশাসনিক ও সামাজিক কাঠামো সহ অবস্থান করেছে।

প্রফেসর বেসেইনের Tribesmen of Chittagong Hill Tracts বইটি একটি মূল্যবান দলিল। এই ক্ষুদ্রকায় বইটিতে বহু মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামের চেহারা সেদিনকার ১৯৫৭–৫৮ সালের চেহারা থেকে বেশ ব্যতিক্রমী। এখনকার পার্বত্য এলাকায় বেশ কিছু মূল্যবান শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। নাগরিক সুযোগ–সুবিধা বর্ধিত হয়েছে। নগরায়ণ-শিল্পায়ন হচ্ছে। উপজাতিরা সর্বরকম শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়েছে। রাস্তাঘাট সম্প্রসারিত হয়েছে ও হচ্ছে। শিল্পায়নের পাশাপাশি সাম্প্রতিক কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে, পুরাতন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তিনটি মহকুমাকে যথা, রাঙ্গামাটি ১৯৮৩ সালে, বান্দরবন ১৯৮১ সালে ও খাগড়াছড়ি ১৯৮৩ সালে, জেলায় উন্নীত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলায় একজন করে ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এই তিনটি জেলাকে চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী লোকসংখ্যা ও উপজাতীয় লোকসংখ্যার নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায় :[৩]

জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	প্রতিবর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব	উপজাতীয় লোকসংখ্যা
রাঙ্গামাটি	২৩৬১.৪৫	৪,০১,৩৮৮	১৭০	২,২৩,২৯২
বান্দরবন	১৭২৯.৩৬	২,৩০,৫৬৯	১৩৩	১,১০,৩৩৩
খাগড়াছড়ি	১০৪২.৩০	৩,৪২,৪৮৮	৩২৯	১,৬৭,৫১৯

২ . সংশ্লিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্যাপটি (লুসিয়ান বারনটের সৌজন্যে প্রাপ্ত) দেখা যেতে পারে।

৩ . সংগৃহীত Zilla Series (B. B. S) O Bangladesh Population Census, 1991 Vol-I Analytical Report (B. B. S) Sept. 1994.

বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চলের 'বান্দরবন' জেলায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ১৩৩ জন লোক বাস করে, যেখানে ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গমাইলে ১০,৩৩৪ জন লোক বাস করে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১৮৬৬ জন।[৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ-সম্পদ আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট এক ভূমিকা পালন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাথাপিছু গড় আয় জাতীয় মাথাপিছু গড় আয়ের চেয়ে ৩২০% বেশি। কিছু কৃষি ফসল, চা ও বনজ সম্পদ এলাকা ভিত্তিক হওয়াতে এলাকার মাথাপিছু গড় আয় সর্বোচ্চ।[৫] অবশ্য এই গড় আয়ের হিসাব কেবলমাত্র সম্পদ ও আয় যোগানের ভিত্তিতে করা হয়েছে, অন্যান্য নির্দেশকসমূহ তুলনা করা হয় নাই।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমন আমাদের অর্থনীতিতে অর্থকরী যোগানদার তেমনি সম্প্রতি এলাকার কিছু সমস্যাও আমাদেরকে ভাবিত করে তুলেছে। অবশ্য প্রফেসর বেসেইনে নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচক ও গবেষক হিসাবে Tribesmen of Chittagong Hill Tracts বইতে প্রাথমিক শিল্পায়নের পরবর্তী সম্ভাব্য সমস্যার কিছু আভাসও দিয়ে গেছেন এই বইতে।

কাপ্তাই বাঁধের উদ্বোধনের পরবর্তী সমস্যা, ছিন্নমূল মানুষের ভবিষ্যৎ ও রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যবস্থাপনা কি হবে এ সমস্ত কিছুই ভাবিত করে ছিল ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর বেসেইনেকে। নৃতাত্ত্বিক গবেষকের এই বইটি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া উপজাতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের আর্থসামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণের জন্য আজকের নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকদের কাছে একটি মূল্যবান দলিল।

প্রথম প্রকাশনায় মূল বইয়ের কিছু ছবি ব্লক করা সম্ভব না হওয়াতে বাদ দিতে হয়েছিল। এবার প্রকাশনা শিল্পের উৎকর্ষতার কারণে সবগুলি ছবিই দেওয়া সম্ভবপর হলো। পরিশেষে পরিমার্জিত রূপে বইটি পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য বাংলা একাডেমীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুফিয়া খান
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
মানবিক বিভাগ
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

১৩৬ শান্তিনগর
ঢাকা ২৫.১০.৯৬

---

৪. ১৯৯১ সালের আদমশুমারির হিসাব মতে।
৫. Chittagong Hill Tracts District Statistics 1983 (B.B. S)

ভূমিকা

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলাম, তখন থেকেই আমার শিক্ষকের লেখা Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts বইটি আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল।

বেশি দূরে নয়, আমাদেরই আশেপাশে এই যে আদিম মানুষগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল আমার বরাবরই ছিল। একটা প্রশ্ন আমার মনে প্রায়ই জেগেছে যে — "পৃথিবীতে যেখানে এত আলোড়ন হচ্ছে এরা কেন আজও সেই আদিমস্তরে রয়ে গেছে?" এ প্রশ্নের উত্তর দিবে জাতিতত্ত্বের ছাত্ররা। এ সমস্ত উপজাতি সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। এদের ভিতরই হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক খণ্ড খণ্ড ইতিহাস পাওয়া যাবে।

বইটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সরেজমিনে গবেষণা ক্ষেত্রে (field study) লিখিত, কাজেই বইটির অনেক জায়গায় একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তাছাড়া লেখক একই শব্দের দুই জায়গায় ব্যবহারে দুই রকম উচ্চারণ লিখেছেন। এটা হয়ত তাদের আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন উচ্চারণও হতে পারে। সে যাই হোক অনুবাদক হিসাবে আমি যেখানে যেভাবে ছিল সেভাবেই সেটা অনুবাদ করেছি। বইটি যে সত্যি আমাদের বিভিন্ন উপজাতি সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সংগ্রহ তাতে কোন সন্দেহ নাই। মূল বইটির কিছু ছবি ব্লক করা সম্ভবপর না হওয়াতে বাদ দিতে হলো। চাকমা ও লুসাই গানগুলি সরাসরি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

পাঠক এই বই পাঠ করে আনন্দ পেলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

৮২ নং শান্তিনগর,
ঢাকা

সুফিয়া খান

প্রস্তাবনা

১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় কাজে বহাল হই। প্রদেশের অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক আমাকে প্রেরণ করা হয়। এই বিভাগটির সঙ্গে নৃতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কেননা তখন স্বতন্ত্রভাবে নৃতত্ত্ব বিভাগ গঠন করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অচিরেই আমি দেখতে পেলাম যে তাদের নিজস্ব সামাজিক অবস্থার উপর খুবই কম বই-পত্র আছে ; তাছাড়া আমি যে বিভাগ খুলতে যাচ্ছি বস্তুত সে সম্পর্কে লিখিত বিবরণাদি এক রকম নেই বললেও হয়। সুতরাং সেদিক থেকেও ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকে বিরাট এক ঝুঁকি নিতে হবে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমি স্থির করলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি গবেষণামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করবো। এ ব্যাপারে আমি নানা দিক থেকে সমর্থন পেলাম।

প্রথমত, আমি জাতিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত থাকাতে প্রথমেই ঠিক করলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের উপজাতিদের সমাজব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করার। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কি কি তথ্য সংগ্রহ করলে প্রধান প্রধান উপজাতি সম্বন্ধে একটি স্বল্প ও আধুনিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায় অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগুলি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা যায় এবং নতুন বিভাগের পাঠও শুরু করা যায়। সুতরাং সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সংক্ষিপ্ত সফর করার মনস্থ করলাম। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং সামাজিক ব্যবস্থার উপর যে সমস্ত প্রকাশিত পুস্তক ছিল, তার সমস্ত কিছুর উল্লেখ আমি আমার এই প্রকরণ-গ্রন্থে (monograph) করেছি।

১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকাতে মিঃ বেসিল জনসন নামে অপর এক ভদ্রলোক ইউনেস্কোর উপদেষ্টা হয়ে এলেন। তিনি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। আমার মতো তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রধান বিষয় ছিল বাঙালি জাতির বসতি সম্পর্কে ভৌগোলিক বিবরণ নেওয়া। তাঁর কর্মসূচিতেও পার্বত্য চট্টগ্রামে একবার সফর করার কথা ছিল। পাহাড়ি গ্রামগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্য আমাদের ভিন্ন হলেও একে অপরের পরিপূরক ছিল যার ফলে আমাদের মিলিত অভিযান সংগঠন করা সম্ভব হয়েছিল। এই বইটি দুইজন লোকের কর্মোদ্যমের একটি অংশ ; কারণ আমাদের দুইজনের গবেষণার ক্ষেত্র আলাদা হওয়াতে

আমাদের পর্যবেক্ষণের ফলও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হলো। যাহোক, প্রয়োজনে আমি মিঃ জনসনের অনুমতি নিয়ে তাঁর টীকা জুড়ে দিয়েছি।

পাঠক এই বইতে পাহাড়ি উপজাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অনেকগুলি ঘটনা বিশ্লেষণ দেখতে পাবেন। এখানে কতকগুলি গ্রাম ও পরিবারের বর্ণনা নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই সমস্ত সীমিত কারণের জন্য আমি এই সমস্ত অধিবাসীর একটি সাধারণ সামাজিক জীবনের বর্ণনা দিয়েছি। যদিও পার্বত্য অঞ্চল[১] সম্বন্ধে এ যাবৎ বিশেষ কোনো বই-পুস্তক লেখা হয়নি, যা'হোক শেষ পর্যন্ত কতকগুলো বই প্রকাশ হতে চলেছে।

চার পাঁচ বছর আগে প্যারিসের মিঃ ও মিসেস বার্নট পার্বত্য অঞ্চলে বহুদিন অবস্থান করে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন, সেগুলোর উপর তাঁরা বর্তমানে কাজ করছেন। জার্মানীর মিঃ কাউফম্যান ও মিঃ লুফার উপজাতিদের নিয়ে একটি প্রকরণ-গ্রন্থ monograph লেখার জন্য তথ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সমস্ত বই যখন প্রকাশিত হবে তখন পাঠকরা আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। আলোচ্য গ্রন্থটি কেবলমাত্র এই বিষয়ে একটি অতিরিক্ত সংযোজন হলেও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সহায়তা করবে।

প্রথমেই আমি ইউনেস্কোকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যার মাধ্যমে আমার পূর্ব পাকিস্তানে আসার সৌভাগ্য হয়েছে, তারপর জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এশিয়াটিক সোসাইটি আমার এই পুস্তকটি প্রকাশনার ভার নেওয়ায় আমি বিশেষভাবে সোসাইটির কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন বিভাগ এই অঞ্চলে আমার পর্যবেক্ষণ কাজের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন ; বিশেষ করে মিঃ জনসন ও আমাকে জিপগাড়ি, পেট্রোল, ড্রাইভার, পাচক, পরিচালক, দোভাষী প্রভৃতি দিয়ে এবং রেস্ট হাউজ ও গ্রামে থাকার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমাদের পরিকল্পনায় যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে চাকমা রাজা ক্যাপ্টেন ত্রিদিব কুমার রায় ও মংরাজা কুমার কমফরু শ্যেন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা

---

১. কতকগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুস্তিকা ও মন্তব্য ছাড়া, যার অধিকাংশই সেকেলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে আমাদের প্রধান গ্রন্থ হলো টি. এইচ. লিউইনের (T. H. Lewin) তিনটি বই : *The Hill Tracts of Chittagong & The Dwellers Therein* (Calcutta 1869) ; *Wild Races of South-eastern India* (London 1870) ; *A Fly on the Wheel* (London 1885) ; -- যা মোটামুটি একই তথ্যের সন্ধান দেয়। এ ছাড়াও R. H. Sneyd Hutchinson-এর *Chittagong Hill Tracts* (in "East Bengal and Assam District Gazetters', Allahabad, 1909), Levi-Strauss-এর *Kinship Systems of Three Chittagong Hill Tribes,* (in 'South-Western Journal of Anthropology', Spring 1952. vol. 6. no. 1) দ্রষ্টব্য।

দু'জনেই আমাদেরকে তাঁদের বাড়িতে সম্মানিত অতিথির মতো আপ্যায়ন করেছেন এবং আমাদের এই বিশেষ কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। প্রশাসন বিভাগের যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে সেচ বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল হাফিজ, ডি. সি. অফিসের জনাব চৌধুরী ও প্রিয়দর্শন দেওয়ান, এস. ডি. ও. জনাব আহমেদ এবং রেভিনিউ বোর্ডের মিঃ বার্নওয়েল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার কেরানি জনাব রহিম এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি টাইপ করে সাহায্য করেছেন। মিঃ বার্নট অনুগ্রহ করে পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়াটি পাঠ করেছেন এবং তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। বৃটিশ কাউন্সিলের মিঃ বল আমার ইংরাজি ভাষার দোষত্রুটি সংশোধন করার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

পরিশেষে একটি মন্তব্যের প্রয়োজন। আমি এ প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যে নীতি অনুসরণ করেছি তা নৃতত্ত্বের প্রবন্ধের নীতি থেকে আলাদা। সেখানে উপজাতিদের "আদিম সমাজের মানুষ" হিসাবেই গণ্য করে গবেষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছি। যারা সভ্যতার প্রভাব হতে দূরে সরে আছে স্বাভাবিকভাবে এই নৃতত্ত্ব নীতি তাদের উপরেই প্রযোজ্য। কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপজাতিদের বেলায় এটা ঠিক নাও হতে পারে, যারা অনেকদিন ধরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ সভ্যতার অংশ হয়ে আছে। সে যাই হোক, আমরা এখানে ঐ বিষয়ের "আদিম সমাজের" "জাতি বিদ্যার" সঙ্গে অতটা জড়িত নই, যতটা "সমাজ বিজ্ঞানের" প্রাচ্যের সমাজ ভিত্তি হিসাবে এটা উপজাতিদের সঙ্গে জড়িত।

পি. বেসেইনে

সূচিপত্র

মি. লুসিয়ান বারনটের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাহাড়িয়া জাতি

যদি কেউ আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে আজও যারা বেঁচে আছে তাদের বোঝায়, তবে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদেরকে আদিম বলে বর্ণনা করলে সত্যের অপলাপ হবে। তারা সভ্যজগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। বস্তুত এরা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং এদের পারিবারিক গঠনপদ্ধতিও কিছুটা হিন্দুদের মত। এতেই প্রমাণিত হয় যে এরা অনেক দিন হতেই সভ্য সমাজের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত।

১৯৫১ সালের আদমশুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, পার্বত্য–চট্টগ্রামে মোট ২,৮৭,৬৮৮ জন লোক বাস করে। এদের মধ্যে উপজাতীয় লোক ২,৬১,৫৩৮ জন ও বাঙালি ২৬,১৫০ জন।

এই ২,৬১,৫৩৮ জন উপজাতীয় লোকদের মধ্যে আবার নানা উপজাতি আছে। এবং তাদের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ :

বন	৯৭৭	মগ	৬৫,৮৮৯
চাকমা	১,২৪,৭৬২	মুরং বা ম্রো	১৬,১২১
খাইয়াং	১,৩০০	পানকো	৬২৭
কমি	১,৯৫১	রিয়াঙ	১,০১১
কুকি	১,৯৭২	তনচাঙ্গিয়া	৮,৩১৩
লুসাই	১,৩৬৯	টিপরা	৩৭,২৪৬

উপরে বর্ণিত উপজাতিদের এগারটির মধ্যে চাকমা, মগ[১], টিপরা, মুরং বা ম্রো ও তনচাঙ্গিয়া এই পাঁচ উপজাতি হ'ল প্রধান। আমাদের বর্তমান আলোচনা টিপরা ছাড়া আর

---

১. Levi-Strauss, (E. Riebek-এর *The Chittagong Hill Tribes* যা ১৮৮২ সনের জরিপের ফল, তা অনুসরণ করে)–এর মতে "মগরা নিজেদেরকে মারমা" বলে। A.H.Keane, London, 1885.

"যদিও এদের মধ্যে ভারতীয় মিশ্রণ দেখা যায় তবুও একথা ঠিক যে আজকের 'আরাকানীরা' মূলত ব্রহ্মদেশীয়। প্রধানত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বহু শতাব্দী ধরে তারা মুসলিম ভারতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আসছে। তাদের ভাষা কিছুটা বাচনিক পার্থক্য জড়িত বর্মী ভাষা এবং এটা পুরাতন ধরনের আঞ্চলিক ভাষা। বিশেষ করে এরা 'র' (r) ধ্বনিকে ধরে রে যেখানে বর্মীরা সেটাকে 'ওয়াই' (y)–তে রূপান্তর করেছে। বাঙালিরা তাদেরকে 'মগ' বলে উল্লেখ করে। এ শব্দটি তারা সপ্তদশ

চার প্রধান উপজাতির উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। যদিও আমরা টিপরা অধ্যুষিত একটি গ্রামে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে আমরা এত অল্প সময় ছিলাম যে তার ওপর কোন গুরুত্ব না দিলেই ভাল হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এই উপজাতীয় লোকেরা মানব জাতিতত্ত্বের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্থায়ী বাসিন্দাদের থেকে আলাদা। এদের সাদৃশ্য রয়েছে তিব্বত থেকে ইন্দোচীন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের পাহাড়িয়া লোকদের সঙ্গে। এরা খর্বকায়, এদের গালের হাড় উন্নত, মাথার চুল কালো, ছোট চোখ—সর্বোপরি শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক থেকে এরা 'মঙ্গোলীয়' জাতির বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

এইসব পাহাড়িয়া লোকেরা গ্রামে বাস করে এবং এ-রকম গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে পাঁচ শতাধিক লোক বাস করে। এদের ঘরবাড়িগুলি খুব সুন্দর।

চাকমাদের ঘরগুলি সম্পূর্ণভাবে বাঁশ দিয়ে তৈরি এবং ঘরের মেঝে মাটি থেকে প্রায় ৬ ফুট উঁচু করে মাচার আকারে তৈরি করা হয়। ঘরটি আবার কয়েকটি 'কামরায়' বিভক্ত এবং কামরার ব্যাপারে বিবাহিত লোকদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। একান্নভুক্ত পরিবারে জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে কামরা ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক পরিবারে যদি তিনজন লোক বিবাহিত হয় তবে 'ঘরটি' মাদুর বা খড়ের বেড়া দিয়ে চার অংশে বা কামরায় বিভক্ত করা হয়। বাইরের কামরাটি কেবলমাত্র অবিবাহিত পুরুষ বা অতিথিদের জন্য এবং এটাকে 'পিনাগিদী' বলা হয়, পরবর্তী কামরা পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ প্রতিনিধি ও তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয় কামরা বিবাহিত দ্বিতীয়

শতকের ইউরোপীয় লেখকদের 'মাগ' (Mugg) থেকে নিয়েছে। আবার চট্টগ্রামের একশ্রেণীর লোক এই নামে অভিহিত যারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিন্তু বাংলা বলে এবং তারা মঙ্গোলীয় নয়। এই শব্দের সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কল্পনাপ্রসূত কথাই লেখা হয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নের এখনও কোনো সমাধান হয় নি।"---D.G. Hall, *A History of South East Asia*. Macmillan, London, 1955. p. 328.

বার্নটের (Bernot) মতে (লেখকের কাছে একটি চিঠিতে), পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত মগদেরকে 'মারমা' বলা উচিত।

"তারা নিজেদেরকে 'মারমা' বলে উল্লেখ করে যার অর্থ হ'ল বর্মী, এবং বাঙালি ও ইংরেজদের বহুল ব্যবহৃত 'মগ' শব্দটি যা জলদস্যুর প্রতিশব্দ হিসাবে এসেছে বলে মনে হয় তা অপছন্দ করে।" Lucien Bernot, *Chittagong Hill Tribes in Pakistan Society & Culture*, edited by Stanley Maron, Human Relations Area Files, 1957,p. 51.

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৫১ সনের আদমশুমারীর তথ্যগুলি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বার্নটের মতে উপজাতিদের তালিকা এমন কি তাদের নামগুলি পর্যন্ত সংশোধন করা উচিত। তিনি 'খাইয়াং'-এর পরিবর্তে 'খায়াং', 'পানকো'র পরিবর্তে 'পানকু' এবং এ ছাড়া 'বনযোগী' ও 'তিচাকে'র নাম তালিকাভুক্ত করার কথা অনুমোদন করেছেন। ম্রো অবশ্যই 'মুরং' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পাঠক হয়ত লক্ষ্য করবেন যে অনেক স্থানে আমি আদমশুমারী প্রদত্ত বানান অনুসরণ করি নি।

পাহাড়িয়া জাতি
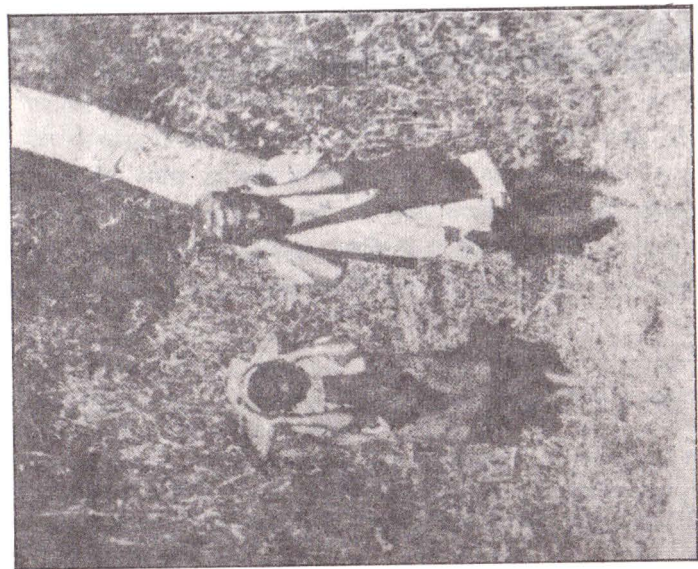
(২) মগ (মারমা)

(১) তনচাঙ্গিয়া চাকমা
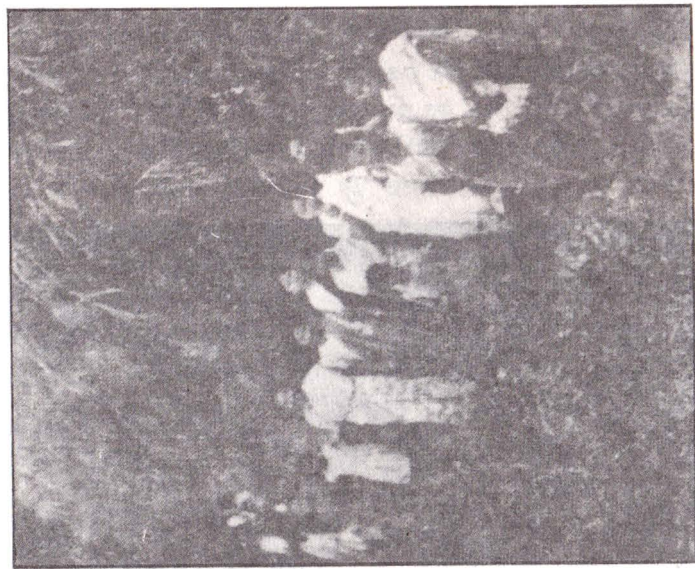
(৩) ম্রো

বয়ঃজ্যেষ্ঠের জন্য এবং চতুর্থ কামরা সর্বকনিষ্ঠ বিবাহিত পুরুষের জন্য। প্রত্যেক কামরা ওচালং বা পিছনের বারান্দাসহ গড়ে ১৫ ফুট লম্বা ও ৫ থেকে ৭ ফুট চওড়া হয়। যখন কামরা করা হয় তখন প্রস্থ বরাবর ভাগ করা হয় এবং ঘরের মধ্য খুঁটিকে বিভক্তিকরণ রেখা হিসাবে ধরে পারিবারিক কামরা চিহ্নিত করা হয় এবং এগুলি পিছনের অংশে হয়। সম্মুখের অংশ অবিবাহিতদের ঘর ও রান্নাঘর হিসাবে ভাগ করা হয়। ঘরের সম্মুখের বারান্দাও মাদুর বা খড়ের বেড়া দিয়ে দুই অংশে ভাগ ক'রে, এক অংশ পুরুষদের ব্যবহারের জন্য ও অপর অংশ মেয়েদের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। পারিবারিক নানা কাজকর্মের জন্য বারান্দার সম্মুখেও বেশ কিছুটা খোলা জায়গা বা উঁচু জায়গা থাকে। খাদ্যশস্য, তুলা বা গার্হস্থ্য জীবনের নানা জিনিস গুদামজাত ক'রে রাখার জন্য এইসব জায়গায় ছোট ছোট কামরাও করা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণত আগুন প্রভৃতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়ি থেকে দূরে গোলাঘর করে শস্য গুদামজাত ক'রে রাখা হয়।

একটি অমসৃণ মইয়ের সাহায্যে ঘরের সম্মুখের খোলা উঁচু জায়গায় উঠে তারপর ঘরে যেতে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যাতে এই উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যেয়ে আঘাত না পায় সেজন্য ৩ বা ৪ ফুট উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে এই জায়গা ঘিরে রাখা হয়। এই রকম সতর্কতা অবলম্বন না করলে মাঝে মাঝে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘরের পিছনের বারান্দাও গুদামজাত কাজে ব্যবহৃত হয় এবং সম্মুখের বারান্দায় লোকজন বসে এবং মেয়েরা বসে বস্ত্রবয়নের কাজ করে।

গঠনের দিক থেকে চাকমাদের ঘরগুলি দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থে বড় হয়। চাকমাদের এই ঘরের বর্ণনা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে অন্যান্য উপজাতিদের ঘরের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।[২]

উপজাতিদের মধ্যে পোশাকের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। চাকমা মেয়েরা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট নীল কাপড়ের উপর লাল ডোরা দিয়ে এক রকম স্কার্ট বা ঘাগরা তৈরি ক'রে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত তা জড়িয়ে পরে। বুকে বক্ষ-বন্ধনী ও মাথায় সাদা রুমাল ব্যবহার করে। পুরুষেরা ধুতি[৩], কোট ও সাদা রুমাল বা পাগড়ি ব্যবহার করে। তনচাঙ্গিয়ারা প্রকৃতপক্ষে চাকমাদেরই একটি শাখা-উপজাতি,—তারা চাকমাদের মত পোশাক পরিধান করে কিন্তু মেয়েদের স্কার্টে লাল ডোরার পরিবর্তে গোটা স্কার্টেই লাল

---

২. হাচিনসন (Hutchinson), *Chittagong Hill Tracts*. ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, ১৯০৯ সন, পৃ. ২৫-২৬ দ্রষ্টব্য।

Levi-Strauss কুকিদের ঘরগুলি চার অংশে ভাগ করেছেন : (১) বারান্দা, (২) প্রধান কক্ষ, (৩) গোলাঘর বা শস্যাগার, এবং (৪) মাচান।--Levi-Strauss, *(Miscellaneous notes on the Kuki of the Chittagong Hill Tracts, Pakistan, in Man*, Dec. 1951, pp. 283-84.)

৩. হিন্দুয়ানী পোশাক।

ও সোনালী সূতার কাজ থাকে। মগপুরুষেরা লুঙ্গি[৪] পরিধান করে এবং মেয়েরা শাড়ি খুব পছন্দ করে। কিন্তু 'ম্রো' পুরুষেরা সাদা লেঙ্গটি (কটিবস্ত্র) ও সাদা পাগড়ি বা রুমাল ব্যবহার করে।.উৎসবের দিনে এই লেঙ্গটি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে পরা হয়। অতীতে এভাবেই কাপড় পরা হতো যার জন্য তাদেরকে একদা 'বানর উপজাতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মেয়েরা খাটো এপ্রনের মতো ক'রে প্রায় এক ফুট চওড়া চারকোণা একটুকরা কাপড় কোমরে জড়িয়ে পরে, যার বামপাশ খোলা থাকে। অবিবাহিত মেয়েরা গায়ে রংগীন চাদর ব্যবহার করে।

এইসব উপজাতির অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে অতীতে 'কুকি'[৫] দল নামে পরিচিত ম্রো ও অন্যান্য ছোট ছোট উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। এখানে চাকমা ও মগদের আগমন তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মূলত কুকি দলের নানা উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। পরে চাকমারা তাদের আক্রমণ ক'রে উত্তর-পূর্ব দিকে তাড়িয়ে দেয়। এই চাকমাদের আস্তানা ছিল চট্টগ্রাম জেলার উত্তর দিকে, কিন্তু ব্রহ্মযুদ্ধের সময় তারা আরাকান হতে আগত মগদের দ্বারা উৎখাত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। অবশেষে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও উত্তর-পূর্ব দিকে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের পূর্ব অধিকৃতজায়গা মগদের আবাসস্থলে পরিণত হয়।[৬]

এই সমস্ত পাহাড়িয়া লোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত এবং আকৃতি, প্রকৃতি ও মৌলিকতার দিক থেকেও দলগুলো ভিন্নতর। ছোট ছোট দলের মধ্যে বনযোগী, পানকো ও লুসাই-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের লোকসংখ্যা বোধ হয় ১৫ হাজারের অধিক হবে না এবং প্রধানত চাকমা সার্কেলেই এদের বাস। মনে হয় এরা এই স্থানের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধর, যদিও এদের মধ্যে এখনও কিছুসংখ্যক লোক 'সর্বপ্রাণবাদে' বিশ্বাসী তবুও বেশিরভাগ লোকই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী (ব্যাপটিষ্ট বা এ্যাডভানটিস্ট) হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব বিশেষ ক'রে লুসাইদের ভিতরই প্রবল। তারা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে যে তাদের ভাষাকে রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত করেছে।

আর একটি ছোট দল হল খাইয়াং—এদের লোকসংখ্যা প্রায় ৫ শত এবং বোমং সার্কেলেই এদের বসতি। বার্মার 'চিন' ও এদের উৎপত্তি একই। এইচ.এন.সি. স্টিভেনসনের মতে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে 'চিনেরা' (Chin) পার্বত্য চট্টগ্রামে হানা দিতে শুরু করে। এদের ভাষা দক্ষিণের চিনদের মতই, কিন্তু এতে 'মারমা' ও 'বাংলা'

---

৪. মুসলিম পোশাক বা বর্মী পোশাক।
৫. কুকি উপজাতি বলতে যাদের বোঝা যায় তাদের সঙ্গে এদের যেন ভুল করা না হয়।
৬. হাচিনসনের বই-এর ৮ পৃ. দ্রষ্টব্য।

শব্দের বহুল মিশ্রণ দেখা যায়। যদিও কিছুসংখ্যক লোক চন্দ্রঘোনার ব্যাপটিস্ট (Baptist) মিশনের প্রভাবে খ্রিস্টান হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ লোকই বৌদ্ধ।

'ম্রো'রাও বোমং সার্কেলেই বাস করে। এদের লোকসংখ্যা চার হাজারের মত এবং এরা সাধারণত পাহাড়ের উপরে গ্রাম সুরক্ষিত ক'রে তাতে বাস করে। লিউইন (Lewin)-এর মতে এই উপজাতি আরাকান থেকে এসেছে কিন্তু হাচিনসন (Hutchinson) মনে করেন যে, এরা "এই জেলার সত্যিকারের আদিম অধিবাসী"। যদিও কিছু লোক বাংলা ও বর্মী ভাষা পড়তে পারে কিন্তু সাধারণভাবে এদের কোনো লিখিত ভাষা নেই।

বোমং সার্কেলের 'মুরং' এবং মং সার্কেলের 'টিপরা'-কে যদিও আজ দুটো ভিন্ন শ্রেণী হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে তবুও মনে হয় তাদের জন্ম বা উৎপত্তি একই ছিল। টিপরাগণ উত্তরের ত্রিপুরা পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে দক্ষিণের দিকে আসতে থাকে। কিংবদন্তী অনুসারে 'মুরং'রা আরাকান রাজের বন্দী ছিল এবং রাজা জোর করে তাদেরকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে আসে। উভয়েরই (মুরং ও টিপরা) ভাষা এক এবং আচার-অনুষ্ঠানও প্রায় একরূপ, কিন্তু টিপরাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে হিন্দু প্রভাব বেশি দেখা যায়।

এইসব দল পরস্পর মিশ্রিত হতে শুরু করেছে, সুতরাং কেবলমাত্র মানব ভাষাতত্ত্বের দিক ছাড়া এদেরকে আর সঠিকভাবে কোনো বিশেষ উপজাতি বলে আখ্যায়িত করা যায় না। যদিও এদের ভিতর কতকগুলি সঠিক স্বীকৃত গোষ্ঠী আছে কিন্তু প্রচলিত প্রথানুযায়ী কোন উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান নাই। অপরপক্ষে চাকমা ও মারমারা সংখ্যায় এত বেশি আর এতটা সুগঠিত যে অনায়াসে এবং নিশ্চিতরূপে এদেরকে উপজাতি বলা চলে।

'মারমা'রা (কোনো কোনো সময় মগও বলা হয়) দুই ভাগে বিভক্ত—একভাগ মং সার্কেলে থাকে এবং লোকসংখ্যা ৪০ হাজারের মত, অপরভাগ 'বোমং' সার্কেলে থাকে এবং এর লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। চাকমা সার্কেলেও কয়েক হাজারের মত মারমা আছে। মারমারা মূলত আরাকান থেকে এসেছে, যদিও কতকগুলি বর্ণনায় দেখা যায় যে তারা 'তেলেঙ্গ' বা 'পেগু'র মত সুদূর দক্ষিণ থেকেও এসেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের ইংরেজী ও বর্মীয় দলিলে 'মারমা' বাস্তুহারাদের সম্পর্কে পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায় এবং সেখানে মারমা বাস্তুহারাদের 'বহুসংখ্যক' ও 'বিরক্তিজনক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুমান করা হয় যে অষ্টাদশ শতকের শেষে বর্মীয় আক্রমণের ফলে আরাকানের দুই-তৃতীয়াংশ লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে।

যেসব মারমা মং সার্কেলের বাসিন্দা, মনে হয় তারা ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে বর্মী আক্রমণকারীদের দ্বারা আরাকান হতে বিতাড়িত উদ্বাস্তুদেরই একটি দল। তারা 'মাতামুরি' উপত্যকার মধ্য দিয়ে এসে প্রথমে কক্সবাজারের চতুষ্পার্শ্বের সমতলভূমিতে আস্তানা গাড়ে, পরে ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারা আরও উত্তরের দিকে 'সীতাকুণ্ডে' চলে আসে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারা সমতলভূমি পরিত্যাগ ক'রে তাদের বর্তমান আবাসস্থল পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে যায়।

দক্ষিণের 'মারমা'রা ভিন্ন পথে অপেক্ষাকৃত আগে এখানে আসে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকান-রাজ বর্মীদের পেগু জয় করতে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি প্রতিদানস্বরূপ কয়েক হাজার তেলেঙ্গ বন্দী পান। এদের ভিতর পেগুর যুবরাজও ছিলেন, যাঁকে পরে কিছুসংখ্যক বন্দীর সঙ্গে চট্টগ্রামের প্রশাসকরূপে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর বংশধরগণ বেশ কয়েক পুরুষ ধরে ক্ষুদে রাজারূপে চট্টগ্রাম শাসন করে। দক্ষিণের মারমারা দাবি করে যে তারা এই তেলেঙ্গ রাজাদের বংশধর, কিন্তু তাদের এই মতবাদে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, তেলেঙ্গ ভাষা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং একথা মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে কালচক্রে তারা এই ভাষা ভুলে গেছে।

বর্তমানে বোমং ও মং সার্কেলের মারমারা অনুরাগী বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদী। তাদের ভাষা বর্মী অক্ষরে লিখিত আরাকানী-বর্মী মিশ্রিত এক আঞ্চলিক ভাষা। এ ছাড়া তারা প্রায়ই বাংলা বলে এবং তাদের কেউ কেউ তা লিখতেও পারে। প্রশাসনের দিক থেকে তারা পাকিস্তানের একটি অংশ হলেও বার্মাকে তারা তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্ররূপে গণ্য করে। এ দ্বারা এটা বোঝা যায় না যে পাকিস্তানের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব আছে, বরং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সদ্ভাব রয়েছে।

দুই দলের প্রত্যেকেরই একজন করে নিজস্ব 'রাজা' আছে। উত্তরের দলের অধিকাংশ লোকই 'পালিনঙসা' গোত্রের এবং এর রাজা হলেন মং সার্কেলের প্রধান বা সর্দার। দক্ষিণের দলের অধিকাংশ লোকই 'রিগ্রিসা' গোত্রের এবং এর রাজা হলেন বোমং সার্কেলের প্রধান বা সর্দার। মারমারা নদী উপত্যকার সন্নিকটে বাস করতে পছন্দ করে এবং কেউ কেউ সমতল ভূমির স্থায়ী বাসিন্দাও হয়েছে। কিন্তু উপরিল্লিখিত ছোট দলগুলি এর পক্ষপাতী নয়। চাকমা উপজাতির জনশক্তি অনুমান এক লাখ এবং এরা চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতীয় দলদের থেকে বাঙালি প্রভাবে বেশি প্রভাবান্বিত। যদিও প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে, মূল চাকমা ভাষা বর্মী অক্ষরে লিখিত ছিল এবং মনে হয় তা বর্মী আঞ্চলিক ভাষাই ছিল কিন্তু তাদের আজকালকার চলতি ভাষা হ'ল বাংলা ভাষার বিকৃত রূপ। এও হতে পারে যে চাকমারা মারমা উদ্বাস্তুদেরই একটি অংশ ছিল যারা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে দেশ ত্যাগ ক'রে এখানে চলে আসে, কিন্তু তারা দাবি করে যে তারা ভারতীয় ক্ষত্রীয় বংশ থেকে উদ্ভূত। এছাড়া তারা সরকারিভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু হিন্দু ধর্মও তাদের কাছে খুব প্রিয় এবং মারমাদের মত তারা উপত্যকা ও সমতলভূমিতে বাস করতে পছন্দ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ছোট দলের মধ্যে 'চাক', 'সেন্দু' বা 'লাখের'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু এদের সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। এ অঞ্চলের অতি সম্প্রতিকালের শান্ত অনুপ্রবেশকারীরা হ'ল বাঙালি, তারা বাজার, শহর ও গ্রামে

অনুপ্রবেশ ক'রে বাড়ি-ঘর, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি তৈরি করেছে। ১৯৪৭ সন থেকে ভারত হতে আগত বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান উদ্বাস্তু এখানে বসতি স্থাপন করেছে।[৭]

গোড়া থেকেই তথাকথিত কুকি উপজাতিরা নবাগতদের কাছে এক আতঙ্কস্বরূপ ছিল। তারা যখন তখন লুণ্ঠনার্থে এদেরকে আক্রমণ করত। এমনকি গত শতাব্দীর শেষের দিকেও যে মুরং সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষ শিকার করত এরকম প্রমাণও আছে। ইংরেজ রাজত্বের সময় ১৮৫৯ [এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম একজন বিশেষ তত্ত্বাবধায়কের (special superintendent) অধীনে রাখা হয়], ১৮৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭২, ১৮৮৮ ও ১৮৯২ সনে কুকিদের লুঠতরাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। অবশেষে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এক চূড়ান্ত সামরিক অভিযান এই উপজাতিদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় এবং তারপর থেকে এই এলাকা সম্পূর্ণ শান্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, আজকাল পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ বাংলাদেশের অন্য যে কোনো অংশে ভ্রমণের মতই নিরাপদ।

---

৭. বারনট্ (Bernot)-এর বইয়ের ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৯৫১ সনের আদমশুমারীর তথ্যগুলি অসংগতিপূর্ণ। আমাদের পাওয়া বোমং ও মং সার্কেলের তথ্যগুলি যা পরে তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে এর বৈষম্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

উপরন্তু অপর একটি উৎস থেকে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় : চাকমারা বিকৃত বাংলা ভাষায় কথা বলে, মগেরা বলে আরাকানী ভাষায় যা বর্মীদের একটি আঞ্চলিক ভাষা এবং টিপরারা তাদের নিজস্ব ভাষায় (যা কাচারী ভাষার সমগোত্রীয়) কথা বলে।

প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপজাতিগুলির মধ্যে রয়েছে চাকমা, যাদের জনসংখ্যা ৪৪ হাজার, মগ ৩৫ হাজার ও টিপরা ২৩ হাজার এবং এরা সব মিলে মোট জনসংখ্যার $\frac{৯}{১০}$ ভাগ। চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতির সম্ভবত আরাকানীয় গোত্র থেকে উদ্ভূত—যদিও বহু বাঙালির সঙ্গে তাদের অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে। চাকমারা প্রধানত তিনটি শাখা-উপজাতিতে বিভক্ত : (ক) চাকমা, (খ) ডুইংনাক ও (গ) টুঙ্গিজাইনিয়া (Tungijainya)। এক শতাব্দী পূর্বে এই ডুইংনাক উপজাতি মূল উপজাতি থেকে পৃথক হয়ে আরাকানে পলায়ন করে, সম্প্রতি কয়েক বছরে কেউ কেউ চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমায় ফিরে এসেছে। 'টুঙ্গিজাইনিয়া'রা এমন কি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান থেকে এখানে চলে আসে এবং কিছু কাল আগে পর্যন্ত তারা আরাকানী ভাষায় কথা বলত। এদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই, তবে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের রেওয়াজ আছে। চাকমারা মধ্য ও উত্তরাংশ অধিকার ক'রে আছে যা সমস্ত জেলার অর্ধেকের কিছু কম। তারা শবদাহ ক'রে থাকে এবং আত্মার শান্তি প্রার্থনা করে। বাঙালিরা মগদেরকে আরাকানের আদিম অধিবাসী বলে জানে। বোমং সর্দারের কর্তৃত্বাধীনে দক্ষিণ সার্কেলেই প্রধানত এদের বাস। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান বর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে পর যে সব আরাকানী এখানে পালিয়ে আসে এদের অধিকাংশই তাদেরই বংশধর। এরা সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত—(ক) ঝুমিয়া (ঝুমচাষী)—যে শব্দ দ্বারা তাদেরকে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে পার্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (খ) রোয়াং বা আরাকানীয় মগ। (গ) বড়ুয়া বা রাজবংশী মগ—বাঙালিদের সঙ্গে এদের অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে। শেষোক্ত ভাগ থেকে নামকরা মগ পাচকদের নেওয়া হয়ে থাকে। টিপরাদের বাস প্রধানত মং সার্কেলে। তাদের সম্বন্ধে "হিল টিপরা স্টেট" প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—ত্রিপুরা রাজ্য হ'ল তাদের আদি বাসভূমি। চাকমা ও মগরা হ'ল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু টিপরারা হ'ল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। *Imperial Gazetteer of India,* Clarendon Press, Oxford, 1908,pp.320-321.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অর্থনৈতিক জীবনধারা

উপজাতীয় লোকেরা কৃষিজীবী। তাদের প্রচলিত কৃষিপদ্ধতিকে 'ঝুম' (Jhuming) বলা হয়—যার অর্থ হ'ল "স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে চাষ।"

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সুবিধামত একখণ্ড জঙ্গলাভূমি ঠিক করা হয়। ভূমি ঠিক করার ব্যাপারে সাধারণত বাঁশ ঝোপ বিশিষ্ট পাহাড়ের গায়ের ঢালু জায়গাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারপর সেই জঙ্গলাভূমির সমস্ত বাঁশ, ছোট ছোট গাছ আর বড় বড় গাছের নিচের ডালপালা কেটে ফেলা হয়। গাছপালা কাটার পর এই কর্তিত 'ঝুম'কে রৌদ্রে শুকাবার জন্য কিছুদিন ফেলে রাখা হয় এবং এপ্রিল মাসে এতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যদি এই ঝুম কাটার পর একদিনও বৃষ্টি না হয় এবং বেশ শুকিয়ে যায় তবে বড় বড় গাছগুলিও পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং জমিও ২/১ ইঞ্চি গভীর হয়ে পুড়ে যায়-- এমতাবস্থায় বৃষ্টির অপেক্ষা না ক'রে আর উপায় নাই। যখনই ভারী বৃষ্টিতে জমি ভিজে যায় তখনই বোনার কাজ শুরু হয় এবং ধান, তুলা, তরমুজ, শসা, ঢেঁড়স, কুমড়া, তিল, সরিষা এবং আরও অন্যান্য ভারতীয় শস্যের বীজ একত্রে মিশ্রিত অবস্থায় বপন করা হয়। এদের এই বপন পদ্ধতি অতি আদিম। এই পদ্ধতিতে সমস্ত বীজ একত্রে একটি পাত্রে মিশ্রিত ক'রে, বপনকারী একটি দা বা কাটারীর সাহায্যে জমিতে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে এই মিশ্রিত বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। এই ঝুম চাষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে বছরের বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ফসল বা তরিতরকারি জন্মে এবং যথাসময়ে তা সংগ্রহ করা হয়। জুলাই মাসের মধ্যভাগে ভারতীয় শস্য পাকে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অন্যান্য তরিতরকারি শাকসবজী, তরমুজ, ধান প্রভৃতি ফসল পাওয়া যায়, আর তুলা ও তিল পাওয়া যায় নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে। এই চাষ পদ্ধতিতে ফসল পেতে হলে যথেষ্ট পরিশ্রম ও সর্বদা সজাগ যত্নের প্রয়োজন হয়। বিশেষ ক'রে ফসল কাটা বা তোলার সময় অন্য যে সব ফসলের চারাগাছ রয়েছে তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। আবার আগাছা যাতে চারাগাছগুলি নষ্ট না ক'রে ফেলে তার জন্য সর্বদা যত্ন নিতে হয়। এ ছাড়াও বন্য শুকর, হরিণ, বানর, কাকাতুয়া, ইঁদুর প্রভৃতির আক্রমণ হতে রক্ষা করার

(৩)

(৪)
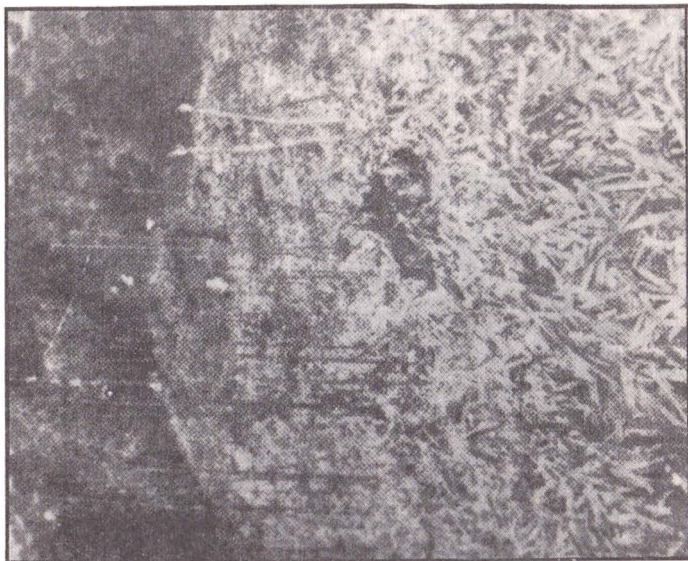
(৬)

জন্য সজাগ পাহারার প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে আবার ইঁদুরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ক'রে থাকে। এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে, কোন কোন স্থানে এই মেঠো ইঁদুরের আক্রমণে মাঠের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে।[১]

ঝুম পদ্ধতিতে চাষ ছাড়াও পাহাড়িয়ারা লাঙ্গল দ্বারাও চাষ ক'রে থাকে। কিন্তু এই লাঙ্গল পদ্ধতিতে চাষ পাহাড়িয়া লোকদের নিজস্ব নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে উপজাতীয় রাজা বাঙালিদেরকে পাহাড়ের নিম্নাংশে যেখানে সেচব্যবস্থা সম্ভব সেরূপ জায়গায় বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে আনেন এবং তারাই তখন এই চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করে।[২] এদের বংশধরেরা এখনও এই স্থান অধিকার ক'রে আছে কিন্তু এদেরকে পাহাড়িয়া না বলে "সমতলভূমির বাসিন্দা" বলা হয়। প্রধানত এরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং দৈহিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাঙালিদের সঙ্গে এদের মিল রয়েছে। প্রায় দেড়শ বছরের মধ্যে অনেক পাহাড়িয়া লোকই এদের কাছ থেকে চাষে লাঙ্গল ব্যবহার করার কৌশল শিখে নিয়েছে। ছোট নদীর ধারে উপত্যকার তলদেশে যেখানে সমতলভূমির সোপান ও জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব সেখানে তারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ ক'রে থাকে। সেই জন্য আজকাল এই অঞ্চলের আবাদীভূমিকে দুই ভাগে ভাগ ক'রে বলা হয় 'ঝুমভূমি' আর 'সমতলভূমি' (লাঙ্গল চাষ)। পরিমাণের দিক থেকে আজও এই পাহাড়িয়া অঞ্চলের অর্থনীতিতে ঝুমভূমিকে লাঙ্গলভূমির থেকে অধিকতর মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে।

সমতলভূমির প্রধান ফসল হ'ল ধান আর রবিশস্য। ধান চাষ আবার দুই প্রকার-- 'আউস' বা প্রথমার্ধের ফসল ও 'আমন' বা শীতের ফসল। আউস ধান জল দ্বারা সেচনযোগ্য ভূমিতে এপ্রিল মাসে বোনা হয় এবং জুলাই মাসে কাটা হয়। আউস ধানের বীজ সাধারণত প্রথমে খানিকটা জায়গায় চারাগাছ করার জন্য ছড়ান হয় এবং পরে চারাগাছগুলিকে তুলে নিয়ে ফসলের ভূমিতে লাগান হয়।

---

১. হাচিনসনের বইয়ের ৬৫ পৃ. দ্রষ্টব্য। পার্বত্য অঞ্চলে সর্বমোট প্রায় ২৪৬৭ বর্গমাইল জমিতে ঝুম চাষ ও বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। আনুমানিক ২৬,০০০ পরিবার প্রতিবৎসর আশেপাশের ১২০ বর্গমাইল জমিতে ঝুম চাষ করে (পরিকল্পনা বোর্ডের তথ্য)।

২. "সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের কোনখানে এমন কোন পাহাড়িয়া লোকের সন্ধান আমি পাইনি যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে। প্রকৃতপক্ষে, ঝুম চাষ ছাড়া অন্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে এমন ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়। কতিপয় সর্দারের গ্রামের কাছে কখনও কখনও কয়েক একর লাঙ্গল চাষের জমি লক্ষ্য করা যায়, তবে তা অবশ্যই এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বাঙালি ভৃত্যেরা দেখাশুনা ক'রে থাকে। সম্প্রতি যে, 'বন সংরক্ষণ বিধি' প্রবর্তিত হয়েছে, মনে হয় তা পাহাড়িয়া লোকদের অনেককেই লাঙ্গল চাষী হিসাবে বসবাস করতে উৎসাহিত করবে।"—Lewin. *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein*, Calcutta, 1869, pp.13-14.

আমন ধানও জুলাই মাসে ছিটিয়ে বোনা হয় এবং বৃষ্টির পানিতে যখন সমস্ত মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায় তখন চারাগাছগুলিকে উঠিয়ে এনে ফসলের মাঠে বা জমিতে রোপণ করা হয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে এই ধান কাটা হয়। চারাগাছ রোপণ করার পর ও ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময়ে কোনো আগাছা রাখা হয় না। এই সময়ে পরিবারের প্রধান ও তার পরিবারের অন্যান্য লোকদের প্রধান কাজ হ'ল ফসলের মাঠকে তদারক করা বা পাহারা দেওয়া এবং পশু–পাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু তাড়ান। এজন্য সে গ্রাম থেকে দূরে পাহাড়ের ঢালুতে অথবা তার ফসলের ক্ষেতের ধারে একটি কুড়েঘর তৈরি ক'রে ফসল কাটার সময় না আসা পর্যন্ত সেখানে পাহারা দিতে থাকে।

উপজাতিদের অর্থনীতিতে রবিশস্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। রবিশস্য বলতে সাধারণত সরিষা, তামাক, মরিচ, মূলা, ঢেঁড়স, ইক্ষু, বেগুন, মিষ্টিআলু প্রভৃতিকে বুঝায়—এগুলির সময় হ'ল অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। রবিশস্যের জমিকে, বিশেষ ক'রে সরিষা উৎপাদনের জন্য, উত্তমরূপে সার দিয়ে তৈরি করতে হয়, যদিও ধানের জমির বেলায় তা করতে হয় না। সার দেওয়ার এক রকম পদ্ধতি হ'ল জমিতে চাষের পূর্বে গো–মহিষাদি বাঁধা (এদের গোবর সারের কাজ করে)।

ধান ও রবিশস্য এই দুই রকম ফসল ছাড়াও পাহাড়িয়ারা সমতলভূমিতে তুলা এবং কাঁঠাল, আম, তরমুজ, লেবু প্রভৃতি ফলের গাছ লাগায়। ঝুমভূমির প্রধান ফসল হ'ল ধান। এই ধান আবার অনেক রকম হয়। ধানের সঙ্গে ঝুমভূমিতে অন্য ফসলও হয়, যেমন নানা প্রকারের ভুট্টা, তিল, তুলা, কুমড়া, তরমুজ, মরিচ, মিষ্টিআলু, শসা প্রভৃতি। যেহেতু অধিকাংশ পাহাড়িয়া লোকই ঝুমচাষী এবং এদের সমতলভূমি নাই, সেহেতু এই ফসলগুলিই তাদের জীবনধারণের প্রধান সম্বল। তারা সব ফসল একই সঙ্গে বপন করে কিন্তু সংগ্রহ করে বিভিন্ন সময়ে।

চাষ সম্বন্ধীয় সবকিছুই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ এক সময়ে তারা ধান চাষ করে আবার অন্য সময়ে তারা রবিশস্যের চাষ করে।

এই পাহাড়িয়া লোকেরা আবার পশুপালনও করে, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার লোকদের মত গো–মহিষাদিও পালন করে। সমতলভূমিতে লাঙ্গল চাষের জন্য তারা ষাঁড় ব্যবহার ক'রে থাকে। গ্রামে কালো শূকরশাবকদের ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে তারা স্বাধীনভাবে তাদের খাবার খুঁজে খেতে পারে। ছাগলদের ছোট চালাতে রাখা হয়, ও মুরগীদের জন্য খোঁয়াড় করে বাঁশের খুঁটি দ্বারা উঁচু করে রাখা হয় যাতে শিয়াল প্রভৃতি না নিতে পারে।

মোটের উপর কৃষিই হ'ল এই পাহাড়িয়া লোকদের প্রধান উপজীবিকা। শিকারের প্রচলন এক রকম নাই বললেই চলে। যদিও মাছ ধরার প্রচলন আছে কিন্তু এর দ্বারা যথেষ্ট খাদ্য সংকুলান হয় না। মাছ সাধারণত জাল দিয়ে ধরা হয়। এছাড়া, নদী–নালার কোন কোন অংশে বাঁধ দিয়ে পানি বের ক'রে ফেলে মাছ ধরা হয়।

উপজাতিরা খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়াও জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্য ধরনের কাজও করে থাকে। তারা নিজেদের ঘর, তাঁত, চুপড়ি ঝুড়ি প্রভৃতি নিজেরাই তৈরি করে এবং নিজেদের কাপড় নিজেরাই বোনে (অবশ্য মগ উপজাতি ছাড়া) । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবার অনেক উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য তাদের অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, যদিও তাদের যন্ত্রপাতি লোহার তৈরি কিন্তু তারা ধাতুবিদ্যা জানে না, আবার তারা মৃৎপাত্র ব্যবহার করে কিন্তু মৃৎবিদ্যা জানে না।[৩] ফলে, এই পাহাড়িয়া লোকদের আংশিকভাবে নির্ভর করতে হয় তাদের উপর যারা উপজাতি নয় অথচ তাদের সঙ্গে বাস করে। সমভূমির বাঙালি বাসিন্দারা কেবলমাত্র লাঙ্গল চাষী হিসাবে মর্যাদা পায় না,—কারিগর ও ব্যবসাদার হিসাবেও তারা মর্যাদা পেয়ে থাকে। উপজাতিরা এই বাঙালিদের কাছে কতকগুলি নিজস্ব উৎপন্নদ্রব্য সরবরাহ করে এবং বাঙালিরা চট্টগ্রাম থেকে জলপথে অন্যান্য জিনিস এদের কাছে আমদানি করে। এইসব কারিগরদের ভিতর আবার কর্মকারের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক জীবনধারায় বাঙালি কর্মকার এক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে।[৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন উৎপন্নদ্রব্যে পারদর্শী। পুরুষরা যেমন কতকগুলি অর্থকরী কাজে লিপ্ত থাকে মেয়েরাও তেমনি কতকগুলি কাজে লিপ্ত থাকে—আবার কতক ক্ষেত্রে যৌথভাবেও কাজ ক'রে থাকে।

---

৩. এই অবস্থা তাদের বংশগত এবং কেন এটা বংশগত হয়েছে তা আজও একটি প্রশ্ন হয়ে আছে। এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে সাম্প্রতিককালে সমভূমির লোকদের আগমনও একটি কারণ হতে পারে। "পূর্বপুরুষদের মাটি, লোহা ও কাঠের কারিগরি শিল্পের কথা আজও তারা স্মরণ করে, বিশেষ ক'রে চাকমা, টিপরা ও মারমারা। কিন্তু উপজাতীয় কুটির শিল্প (হাতের কাজ) বর্তমানে প্রায় লোপ পেতে বসেছে।"—Lucient Bernot-এর *Chittagong Hill Tribes* প্রবন্ধে Pakistan Society & Culture বই-এর ৫৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

৪. মৃৎপাত্র ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস সমভূমি থেকে এনে এখানকার বাজারগুলিতে বিক্রি করা হয়। প্রায় সব বাজারেই একজন করে বাঙালি কামার আছে, সে দা, ছুরি, ধারালো অস্ত্র ও পুরানো কেরোসিনের টিন কেটে ছোট ছোট জিনিস তৈরি করে। এছাড়া সে ছাতা মেরামত করে এবং এমন কি বন্দুক নির্মাতা হিসাবেও কাজ করে। কিছুসংখ্যক পাহাড়িয়া লোকের বাঁশের কাজের প্রতি ঝোঁক আছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালিরাই ছুতোরের কাজ ক'রে থাকে।

এই অঞ্চলে বয়নশিল্পের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় এবং এখন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ঘরেই একটি ক'রে তাঁত আছে। কিন্তু বাজারে মিলের তৈরি সস্তা কাপড় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তা দ্রুত তাঁতের কাপড়ের স্থান দখল করছে, এমনকি ভোজ ও উৎসবাদিতেও এর প্রচলন দেখা যাচ্ছে। বেচা-কেনা কেবল বাজারেই সীমাবদ্ধ নয়, কারণ অনেক বাঙালি ফেরীওয়ালা কাপড়, এলার্ম ঘড়ি, চিরুনী, অলংকারাদি, লোনামাছ, ছাতা, চামচ, থালা, গ্লাস, কাপ ও এই রকম নানা মনিহারী জিনিসের পসার নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বিক্রি করে।—Lucient Bernot-এর বইয়ের ৫৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

একটি গ্রামের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত স্ত্রী ও পুরুষের কর্মসূচির মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

পুরুষ	স্ত্রী	উভয় (মিলিতভাবে)
জমি চাষ, লাঙ্গল দেওয়া, ঝুম কাটা ও বীজ বপন করা, ঝুড়ি বা চুপড়ি তৈয়ার করা, কাঠের কাজ, মাদুর, দোলনা, ঘরের দেয়াল, বেড়া দেওয়া, যন্ত্র-পাতি বানান, দুধ দোয়ানো, শিকার (গ্রামে ৪টি বন্দুক আছে) করা, জাল ও ফাঁদ দিয়ে মাছ ধরা।	তাঁত চালনা (হাতে), কাপড় বোনা, রং করা, ঘরবাড়ি ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার রাখা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, রান্না করা ও সংসারের যাব-তীয় সরঞ্জাম ঠিক রাখা।	পরিষ্কারকরণ, চাষ-আবাদ ও ফসল কাটা ও সংগ্রহ করা, ছেলেপেলে ও গৃহপালিত পশুর যত্ন নেওয়া, নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি নিকাশ ক'রে চুপড়ি দিয়ে মাছ ধরা।[৫]

স্ত্রী ও পুরুষের ওপর ন্যস্ত কৃষি ও গৃহকর্মের দায়িত্ব সম্পাদনের কাজ প্রতি বছর চক্রাকারে আবর্তিত হয়। নিম্নে বর্ণিত তালিকায় একটি গ্রামের বিভিন্ন সময়ের কাজের এক ফিরিস্তি পাওয়া যায় :

মাস	সমভূমিতে কাজ	ঝুমভূমিতে কাজ	অন্যান্য কাজ
জানুয়ারি	ধান মাড়াই ও গুদামজাত করা। লাঙ্গল ও মই দ্বারা ধানের জমি চাষ করা। সরিষা কাটা।	ভাল ভাল বাঁশ রেখে ঝুমের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা।	ঘরবাড়ি তৈরি ও মেরামত। স্ত্রী লোকেরা জ্বালানি সংগ্রহ করে, ঝুড়ি তৈরি করে, তুলা পরিষ্কার করে (বীজশূন্য করা), সূতা কাটে, রং করে, সূতীবস্ত্র বয়ন করে (কিছু গজ কাপড় কেনাও হয়)।
ফেব্রুয়ারি	সরিষা কাটা ও মাড়াই করা। তামাক, মরিচ, আলু ও তরিতরকারি তোলার কাজ শুরু হয়।	ঝুম কাটা।	×

৫. সংবাদদাতা বিজয় কুমার দেওয়ান (চাকমা উপজাতি), রাঙ্গাপানি মৌজা নং ১০২, গ্রাম কাটাচারী। ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৯৫৭ সালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মার্চ	আউস ধান লাগান হয় (বৈশাখী ও বছরের প্রথমার্ধের ধান)। পাটের জন্য রবিশস্যের ক্ষেত চাষ করা হয় (সব নয়)।	×	×
এপ্রিল	জমি চাষ করা এবং পাট ও ধান বোনা।	ঝুম পোড়ান।	ঝুমে কুঁড়ে ঘর তৈরি।
মে	আমন ধানের বীজ জমিতে লাগান।	প্রথম বর্ষণের সঙ্গে ঝুমে বপনের কাজ শুরু।	রোপণ কাজে খুব ব্যস্ত।
জুন	আউস ধান কাটা ও আমন ধানের জন্য জমি চাষ করা ও মই দেওয়া।	দ্রুত রোপণের কাজ চলতে থাকে।	বয়নের (বস্ত্র) কাজ বন্ধ।
জুলাই	×	লতাগুল্ম প্রভৃতি পরিষ্কার করা। শাকসব্জী, বেগুন প্রভৃতি সংগ্রহ করা।	×
আগস্ট	পাট কাটা, পচান, শুকান প্রভৃতি কাজ।	তরিতরকারি, প্রথমার্ধের ধান, তুলা, তিল প্রভৃতি জমি থেকে সংগ্রহ করা।	×
সেপ্টেম্বর	রবিশস্য যেমন—সরিষা, পেঁয়াজ, মরিচ, মূলা, মটর, শসা, বেগুন, তামাক প্রভৃতি বোনার জন্য জমি প্রস্তুত করা।	শেষার্ধের ধান কাটা।	বিক্রয়ের জন্য বাঁশ ও ঘাস কাটা।
অক্টোবর	×	×	×
নভেম্বর	আমন ধান কাটা ও আউস ধানের জন্য জমি চাষ করা।	ঝুমের কাজ শেষ হয় এবং ঝুম আবার আগের মত বুনো লতা পাতায় ভরে যায়।	বয়নের কাজ শুরু হয়।[৬]
ডিসেম্বর	×	×	×

৬. বেসিল জনসনের বর্ণানুযায়ীও স্ত্রী–পুরুষের শ্রমবিভাগের একই রকম তালিকা দেখা যায়।

উপজাতীয় লোকদের চারটি প্রধান কারিগরি যন্ত্র হ'ল—দা, লাঙ্গল, মই ও হস্তচালিত তাঁত। দা হ'ল ছোট বাঁশের হাতা লাগান লোহার তৈরি এক ধারওয়ালা অস্ত্রের ফলক, যা অনেক কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন—জঙ্গল পরিষ্কার করা, বাঁশের নানা আকৃতির জিনিস প্রস্তুত করা প্রভৃতি।[৭] এই দা (মূল্য প্রায় দু' টাকা) ফরমাশ অনুযায়ী বাঙালি কর্মকারেরা তৈরি ক'রে দেয়। এদের ব্যবহৃত লাঙ্গল সাধারণ বাঙালিদের লাঙ্গলের মত। কৃষকেরা নিজেরাই তা তৈরি করে। শুধু লাঙ্গলের অগ্রভাগের লোহার ফলা কর্মকার তৈরি করে দেয়। মই এবং হস্তচালিত তাঁতও তারা নিজেরাই তৈরি করে। বস্তুত প্রত্যেক স্ত্রীলোকের (মগ ছাড়া) নিজের তৈরি নিজস্ব-হস্তচালিত তাঁত আছে।[৮]

পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতিতে বাঁশ একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ। এই চমৎকার জিনিসটি অনেক কাজে ব্যবহার করা যায়।[৯] জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। উপজাতিরা দা-এর কয়েক ঘা দিয়ে যে কি নিপুণভাবে বাঁশের দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করে তা দেখে অবাক হতে হয়। বেড়ানোর ছড়ি, লাঠি, পানির পাইপ প্রভৃতি মুহূর্তের মধ্যে তৈরি করে ফেলে। এদের ঘরগুলি সম্পূর্ণই বাঁশের তৈরি। তিনমাস বা তারও অনেক কম সময়ে তারা একটা ঘর (বাড়ি) তৈরি করতে পারে। মাকু ও হস্তচালিত তাঁত বাঁশের তৈরি, অবশ্য এর কিছু অংশ কাঠের। কচি অথচ শক্ত বাঁশ অনেক দিন পর্যন্ত সতেজ ও পরিষ্কার থাকে। বাঁশের দরুন গ্রামগুলি ঝোপ-ঝাড়ের মত দেখায়, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উপজাতিদের অর্থনীতি প্রধানত 'জীবনধারণ অর্থনীতি'—তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জিনিস উৎপাদন করে। তবে সম্প্রতি এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক অর্থনীতি গড়ে উঠাতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিময় প্রথা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছুসংখ্যক শিক্ষিত পাহাড়িয়া লোক সরকারি চাকুরি করে এবং অন্যান্যরা কর্ণফুলী নদীর তীর ঘেঁষে বিভিন্ন কোম্পানি যে সব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে সেখানে অথবা কন্ট্রাকটরদের অধীনে কারখানাগুলিতে মজুরের কাজ ক'রে। এই সমস্তই পাহাড়িয়া লোকদের অর্থনীতিতে আর্থিক আয় ও বিনিময় এনে দিয়েছে। অবশ্য ওই অঞ্চলকে বাণিজ্যিক ক'রে তোলার ব্যাপারে এগুলিই প্রধান কারণ নয়। বাণিজ্যিক বা অর্থ উপার্জনের মনোভাব প্রধানত দুইটি

---

৭. "মে মাসের শেষের দিকে এবং জুন মাসের গোড়ার দিকে আগাছা পরিষ্কার করার কাজ আরম্ভ হয় এবং ফসলকাটার পূর্বে কমপক্ষে দুই বার আগাছা পরিষ্কার করা হয়। আগাছা পরিষ্কার করার জন্য চাকমা, মারমা ও টিপরারা দা ব্যবহার করে কিন্তু ম্রো ও কুকিরা নিড়ানি ব্যবহার করে।"—Lucien Bernot-এর বইয়ের ৫২ পৃ. দ্রষ্টব্য।

৮. পার্বত্য অঞ্চলের মগ উপজাতিরা কক্সবাজারের মগ তাঁতিদের তৈরি কাপড় কেনে।

৯. সম্প্রতি পার্বত্য অঞ্চলের চন্দ্রঘোনাতে সরকার কর্তৃক কাগজের মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে শিল্প হিসাবে এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

অন্যতম কারণ থেকে এসেছে—একটি হ'ল এইসব ছোট্ট পাহাড়িয়া শহর এবং তার বাঙালি অধিবাসীদের খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা। বাঙালিরা স্বাধীনতার পর থেকে সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে—বিশেষ ক'রে কৃষিকার্যে নিয়োজিত নয় এমন সব লোকজনই বেশি (ব্যবসায়ী বা বণিক শ্রেণীর লোক)। পাহাড়িয়া লোকেরা এদের জন্য তরিতরকারি ও শাকসব্জী সরবরাহ করে এবং এসবের পরিবর্তে তারা যা টাকা-পয়সা পায় তা দিয়ে শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে। প্রত্যেক পাহাড়িয়া শহরে একটি বাজার আছে এবং এই বাজারে সপ্তাহে একবার বা কোন সময়ে বেশিবার উপজাতীয় লোকেরা বেচা-কেনা ক'রে থাকে। বাজারের দিনের প্রারম্ভে যদি কোন ভ্রমণকারী নোংরা অমসৃণ পাহাড়িয়া পথ বেয়ে চলতে থাকেন তবে তিনি লক্ষ্য করবেন যে, পাহাড়িয়া লোকদের এক লম্বা সারি শহরের দিকে যাচ্ছে—সঙ্গে ঝুড়িতে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে খাদ্য সামগ্রী। দিনের শেষে আবার তাদের দেখতে পাবেন—তখন তারা নিজের গ্রামে ফিরছে।

'জীবনধারণ অর্থনীতির' জায়গায় ধীরে ধীরে 'বিনিময় অর্থনীতি' ঢোকার আর একটি কারণ হ'ল চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন। চট্টগ্রাম শহর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের এলাকা থেকে অধিকতর খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। অনেকগুলি দিকের মধ্যে এটি হ'ল একটি যেদিকে পার্বত্য অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি মোড় নিতে যাচ্ছে। বস্তুত সমতলভূমির অনেক বাসিন্দা চট্টগ্রাম শহরের জন্যই পাহাড়িয়া শহরের বাজার থেকে তরিতরকারি ক্রয় করে এবং এইসব জিনিস তারা কর্ণফুলী নদী দিয়ে নৌকা ক'রে শহরে চালান দেয়।

সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতি পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শহর-গ্রামের বিনিময় সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপ নিতে এখনও অনেক দেরী আছে।[১০]

---

১০. পার্বত্য উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট সংখ্যা ১ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক প্রতিষ্ঠান

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া লোকদের সাধারণত উপজাতি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে তাদের সংগঠনে উপজাতিই প্রধান। কিন্তু এটা কেবল আংশিকভাবে সত্য। যদিও উপজাতীয় বন্ধন তাদের জীবনে একটি অতি বড় স্থান দখল ক'রে আছে কিন্তু সেটা অন্য সব অসভ্য জাতির মত অতটা গুরুত্বপূর্ণভাবে নেই। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি বন্ধন বড় শিথিল—এদের সত্যিকার কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান নাই যার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকারের রীতিনীতি এদের উপর আরোপ করা হয়েছিল যা ক্রমে ক্রমে আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। এছাড়া উপজাতিগুলি গোষ্ঠী, পরিবার, আঞ্চলিক ও গ্রাম্য সম্প্রদায় প্রভৃতিতে বিভক্ত এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলির প্রভাব অত্যধিক।

করাচীকে কেন্দ্রীয় রাজধানী ক'রে পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুই ভাগে বা প্রদেশে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক প্রদেশ আবার ছোট ছোট প্রশাসনিক কেন্দ্রে বিভক্ত।

পূর্ব পাকিস্তানকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা : রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। কিন্তু এই বিভাগগুলি ছাড়াও চট্টগ্রাম বিভাগের উপজাতি অধ্যুষিত এই পার্বত্য অঞ্চলটি তার বিশেষ স্বকীয়তা নিয়ে বিদ্যমান। চট্টগ্রাম বিভাগের পূর্ব দিকে অবস্থিত এই অঞ্চলটি পূর্ব পাকিস্তানের শাসন পদ্ধতির সাধারণ নিয়মকানুনের আওতায় পড়ে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বতন্ত্র জেলা এবং এর সদর দফতর হ'ল রাঙ্গামাটি। এই জেলা একজন ডেপুটি কমিশনারের এখতিয়ারভুক্ত। ডেপুটি কমিশনার প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে থাকেন এবং তার ওপর কার্যনির্বাহ, প্রশাসন ও বিচার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। এই জেলা আবার তিনটি মহকুমায় বিভক্ত, যথা : রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবন এবং প্রত্যেক মহকুমা একজন মহকুমা হাকিমের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে।

প্রত্যেক মহকুমা আবার কতকগুলি থানায় বিভক্ত। বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বা কাঠামো বাঙালিদের হাতে, পাহাড়িয়াদের হাতে নয়। কিন্তু এরই পাশাপাশি অপর কাঠামো আছে যার মাধ্যমে পাহাড়িয়ারা প্রচলিত সাধারণ কাঠামোর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। এই দুই কাঠামো বা পদ্ধতির পাশাপাশি অবস্থানই এই পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমন তিনটি মহকুমায় বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি একজন ক'রে অ-উপজাতীয় অফিসারের অধীনে তেমনি তা আবার তিনটি অনুরূপ সার্কেলে বিভক্ত। প্রত্যেক সার্কেলের প্রধানকে রাজা বা সর্দার বলা হয়। এই সার্কেল আবার কতকগুলি 'মৌজায়' বিভক্ত এবং প্রত্যেক 'মৌজায়' একজন ক'রে 'মাতবর' (মোড়ল) আছে। এই মৌজা আবার কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে 'কারবারী' বলা হয়। এই শাসন-পদ্ধতি অবশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের শাসন-পদ্ধতি থেকে আলাদা। সেখানে বিভাগ, জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রাম এইভাবে কাঠামোকে ভাগ করা হয়। একটি ইউনিয়ন বোর্ড হ'ল কতকগুলি স্বতন্ত্র গ্রামের সমষ্টি। পার্বত্য অঞ্চলে গঠন-পদ্ধতি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু ক'রে মহকুমায় এসে থামে এবং আবার জেলা থেকে শুরু ক'রে নিচের দিকে নামতে থাকে—সার্কেল, মৌজা, গ্রাম।[১] এই অতিরিক্ত গঠন প্রণালী পূর্ব পাকিস্তানের আর কোথায়ও দেখা যায় না। তার কারণ হ'ল এখানে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক গঠন-পদ্ধতি পাহাড়িয়া লোকদের ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে করা হয়েছে। কিন্তু সার্কেলের বিভক্তিকরণ উপজাতীয় বিভক্তিকরণের অনুরূপ নয়।[২]

---

১. "আদমশুমারীতে বর্ণিত পূর্ববাংলার গ্রাম কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চলের কতক অংশে দেখা যায়, যেখানে তারা আত্মরক্ষা ও একত্রে থাকার সুবিধার জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে। একটি মগ বা একটি চাকমা গ্রামের ঘরবাড়ি অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত এবং সেখানে এক বিশেষ ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধতার পরিবেশ বিরাজ করে।"–Nafis Ahmed. *The Pattern of Rural Settlement in East Pakistan*, in the Geographical Review, Vol.XLVI No.3, 1956,pp.390 and 394.

২. "১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলার অংশ হিসাবে ছিল, তারপর চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করে 'পাহাড় তত্ত্বাবধায়ক' (Hill Superintendent) নামে একজন কর্মকর্তার অধীনে দেওয়া হয়। সাত বছর পর তার কাজের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ডেপুটি কমিশনার (প্রশাসন) আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮৯১ সালে লুসাই পাহাড় সংযোজিত হলে পর এই অঞ্চলের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায় এবং এই অঞ্চলকে মহকুমা পর্যায়ে নামিয়ে এনে একজন সহকারী কমিশনারের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয় যার পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হলেন বিভাগীয় কমিশনার। ১৯০০ সালে ১নং রেগুলেশনের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে আবার জেলায় পরিণত করা হয় এবং পুরাতন তত্ত্বাবধায়ক (superintendent) পদবী ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে পরিগণিত হয়। সীমানা পরিবর্তন ক'রে পূর্বদিকের ১,৫০০ লোক অধ্যুষিত 'ডেমাগিরি' অঞ্চলসহ কিছু অংশ লুসাই পাহাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। এই একই সময় জেলাটিকে চাকমা, মং ও বোমাং সার্কেলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি সার্কেল একজন প্রধান (chief) বা সর্দারের এখতিয়ারভুক্ত হয়। রাজস্ব আদায় ও নিজ এলাকার গ্রামগুলির আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব এই প্রধানদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। চাকমা সার্কেল জেলার মধ্য ও উত্তর অংশে, বোমাং সার্কেল দক্ষিণে এবং মং সার্কেল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্যেক গ্রামের ভার একজন 'মাতবর' বা হেডম্যানের উপর ন্যস্ত হয়। সে রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং তার জন্য কিছু বখরা পায়। বসবাসের উদ্দেশ্যে রায়তদের এক সার্কেল থেকে অন্য সার্কেলে গমন যতটা সম্ভব নিরুৎসাহিত করা হয়।"—Imperial gazetteer of India, পৃষ্ঠা ৩২৩ দ্রষ্টব্য।

"একজন জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা শাসন ক'রে থাকেন। এই জেলার সদর-দফতর রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত। রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবন এই জেলার তিনটি মহকুমা। প্রত্যেকটি মহকুমা একজন মহকুমা অফিসারের শাসনাধীন। মহকুমা তিনটির সদর-দফতর

চাকমা, মং ও বোমাং এই তিন রাজাকে যথার্থ অর্থে এখন আর উপজাতীয় সর্দার বলা যায় না। তাদের সার্কেলের সীমারেখা উপজাতীয় বিভাগ অতিক্রম করেছে। যদিও চাকমা সর্দার ও মং সর্দার যথাক্রমে অধিক সংখ্যক চাকমা ও মগ অধ্যুষিত এলাকা শাসন ক'রে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তিন রাজার প্রত্যেকের এলাকায় বিভিন্ন উপজাতিও আছে। কোন আইনগত স্বীকৃতি না থাকাতে এই উপজাতি কোন রাজনৈতিক ধরনের ঐতিহ্যগত বা প্রশাসনিক কাজ করে না। এরা কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয় রক্ষা করে।

একটি উপজাতি কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। উপজাতির লোকসংখ্যা অনুসারে গোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। একটি ছোট উপজাতি যেমন মুরং-এর ৫টি গোষ্ঠী আছে।[৩] কিন্তু মগরা সংখ্যায় অনেক। তাদের ভিতর ২১টি গোষ্ঠী আছে।[৪] এবং চাকমাদের (সবচেয়ে বড় উপজাতি) ২৪টি গোষ্ঠী আছে।[৫] উপজাতির মত গোষ্ঠী-বন্ধনও

রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবনে অবস্থিত। মহকুমার অনুরূপ উপজাতীয় মূল অংশ তিনটি সার্কেলে বিভক্ত এবং সার্কেল প্রধান মহকুমা অফিসারের পদমর্যাদা একই ধরনের তবে কাজের দায়িত্ব ভিন্নতর। মহকুমা অফিসার প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং তিনি প্রধানত তত্ত্বাবধায়ক ও যোগাযোগকারীর দায়িত্ব পালন ক'রে থাকেন। সার্কেল প্রধান নিজ এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও খাজনা আদায় ক'রে থাকেন। প্রত্যেক সার্কেল কয়েকটি মৌজায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক মৌজা একজন মৌজা-প্রধানের অধীন। সমগ্র জেলায় মোট ৩৭৩টি মৌজা আছে এবং প্রত্যেক মৌজা প্রায় ১০টি গ্রাম বা পাড়া নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক গ্রাম-প্রধানকে 'কারবারী' বলা হয়। 'কারবারী' ও 'মাতবর' বা হেডম্যানের পদ বংশানুক্রমিক।"-Lucien Bernot, পৃ. ৪৯ দ্রষ্টব্য।

সার্কেল বিভাগসমূহ : "পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সংরক্ষিত বন, চাকমা, বোমাং ও মং—এই তিন প্রধানের সার্কেল এবং মৈনী উপত্যকা নিয়ে গঠিত।"-*Chittagong Hill Tracts Manual.* Bengal Govt. Press, Alipore 1942,p.29,article 35.

৩. পুরাতন তথ্য অনুযায়ী (Hutchinson-এর বইয়ের ৪২ পৃ., ১৯০৯ দ্রষ্টব্য)। সাম্প্রতিক তথ্য ভিন্নতর হতে পারে, কিন্তু আমার সে তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ হয় নি।

৪. তথ্য সরবরাহকারী : মং প্রধান, ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৯৫৭ সন।

৫. তথ্য সরবরাহকারী : চাকমা প্রধান, ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৫৭। Lewin-এর মতে "মূল চাকমারা ডুইংনাক ও টুঙ্গিজাইনিয়াদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ২১টি 'গোজা' বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একজন উপজাতির চেহারা ও পোশাক দেখে বোঝা যায় সে কোন্ গোত্রের লোক।"-Lewin, পৃ.৬৭।

Levi-Strauss-এর মতে—"চাকমাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পিতৃবংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়। পিতার পরে প্রথম পুত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই রকম প্রায় ৩০টি বংশ আছে। তাদেরকে গোষ্ঠী (gusti) বলা হয়। আগের মত প্রতি বছর না ক'রে বর্তমানে ৪ বা ৫ বছর অন্তর অন্তর প্রত্যেক গোষ্ঠী (gusti) পূর্বপুরুষদের স্মরণে জমকালো ভোজের ব্যবস্থা ক'রে থাকে। রাজ-গোষ্ঠীর (gusti) লোকেরা 'ফি' (fi) নামে এক বিশেষ যাদু ক্ষমতার অধিকারী হয়—এই ক্ষমতা সাধারণ লোকদের জন্য বিপদজনক।"-Levi-Strauss-এর *Kinship systems*-এর ৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

মং প্রধান
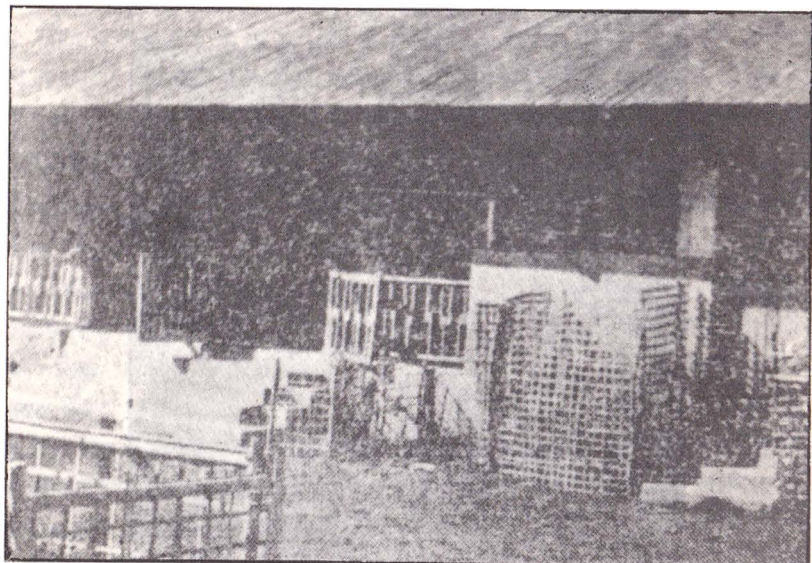
(৭) বসত বাড়ী
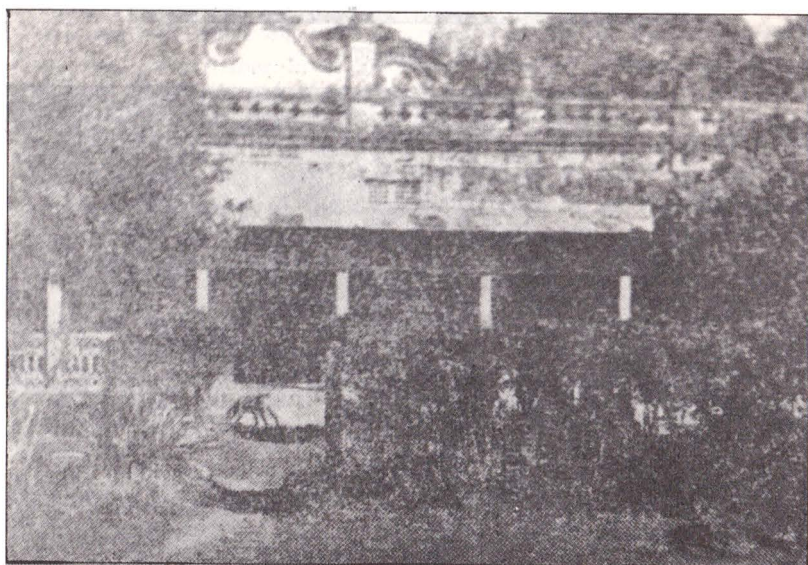
(৮) অতিথি শালা

(৯) উপজাতীয় প্রধান
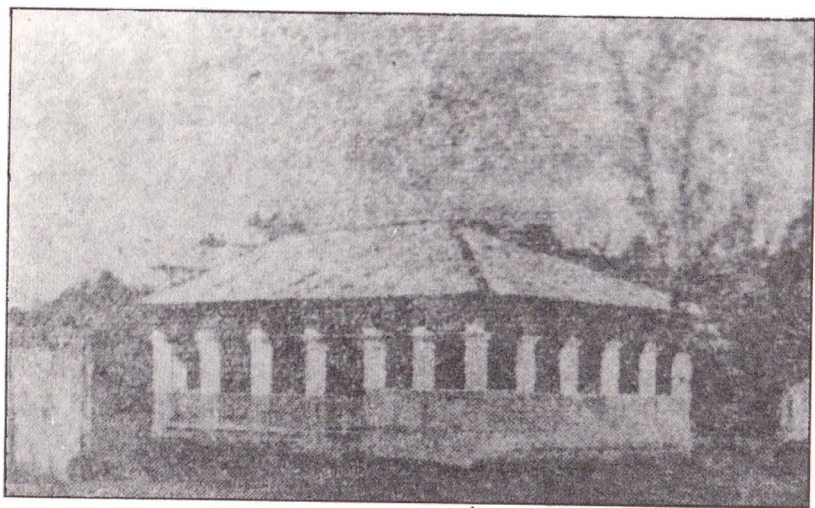
(১০) সরকারী অফিস
(রাজস্ব সংগ্রহের জন্য)

বড় শিথিল।[৬] সাধারণত অসবর্ণ বিবাহের রীতি নাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অন্য গোষ্ঠীতে বিবাহ উদারতার সঙ্গে নেওয়া হয়।[৭] উপজাতিদের মধ্যে অবশ্য এই মনোভাবের তারতম্য দেখা যায়। কখনও কখনও অসবর্ন বিবাহ অবজ্ঞার সঙ্গে দেখা হয়। চাকমাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো পতি বা পত্নীর গত সাত পুরুষের ভিতর একই পূর্বপুরুষ নেই।[৮] গোষ্ঠী দলগুলি গোটা উপজাতীয় এলাকায়ই ছড়িয়ে আছে। সাধারণত একটি গ্রামে একের অধিক জ্ঞাতি–গোষ্ঠী থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপজাতীয়দের মধ্যে পিতৃবংশের দ্বারাই বংশ পরিচয়ের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত হয় না, পিতৃ পরিচয়ে পরিচিত হয়। সে মায়ের দিকের নিকট–আত্মীয়কে বিয়ে করতে পারবে না কিন্তু তার মৃতদেহ মাতা পিতা উভয়কুলের উপস্থিতিতে দাহ করা হয়। সুতরাং এইভাবে মাতৃধারা কিছুটা স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সত্যিকারভাবে কেবলমাত্র পিতৃধারার প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরাধিকারের ব্যাপারে, পিতার সম্পত্তির[৯] অধিকারী হয় কেবলমাত্র পুত্রেরা। পুত্রের অবর্তমানে কন্যারা সম্পত্তিলাভ করে কিন্তু সেটাও তারা পুরুষ উত্তরাধিকারীদের বা বংশধরদের দেয়। পিতার গৃহ বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি সব পুত্রের মধ্যে সমভাবে বন্টন করা হয় এবং কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতার গৃহের অধিকারী হয়।[১০]

---

৬. আদি মগরা তাদের গোষ্ঠীর জন্য কোনো পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে না, যদিও তাদের কথাবার্তা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য (যেমন পাগড়ি বা মাথায় কাপড় বাঁধবার নিয়ম) অতীতকালে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠী আলাদা করা হত।”– Levi-Strauss-এর *Kinship System of Three Chittagong Hill Tribes*. In South-Western Journal of Anthropology, Spring 1952, p.50 দ্রষ্টব্য।

৭. শতকরা ৯৮ জন মারমা সমগোত্রে বিবাহী (Lucien Bernot in a letter to the writer)। “মারমা ও টিপরাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের প্রচলন আছে। বিধবাদের বেলায় এর অবশ্য ব্যতিক্রম হয়, সে তার নিজ গোষ্ঠী অপেক্ষা নিকৃষ্টতর গোষ্ঠীতে বিবাহ করতে পারে এবং প্রায়ই এসব ব্যাপারে ছেলের বয়স মেয়ের বয়স থেকে কম হয়। অন্যদিকে ম্রোদের অন্য গোষ্ঠীতে বিবাহ করা বাধ্যতামূলক। মারমারা বংশ পরিচয় খুব সাবধানতার সঙ্গে বিচার ক'রে দেখে যাতে বর ও কনের মধ্যে অজাচার সম্পর্ক স্থাপিত না হয় এবং এটাই মারমারা খুব ভয় করে।” (Lucien Bernot, p.56)।

৮. তথ্য সরবরাহকারী : মদন হেডম্যান পাড়ার তনচাঙ্গিয়া উপজাতির চন্দ্রমোহন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সন। তথ্যটি চাকমা রাজা কর্তৃক সমর্থিত।

৯. ‘সম্পত্তি’ বলতে অস্থাবর (ঘরও এর ভিতর পড়ে) সম্পত্তি ও সমতলভূমি বুঝায়। ঝুমভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না, কারণ যে কেউ তার নিজস্ব ঝুমভূমির দাবি করতে পারে।

১০. Levi-Strauss-এর মতে (যার তথ্য আমি যাচাই করার মত সুযোগ পাই নি), যদিও গোত্রগুলি পিতৃকুল রক্ষা ক'রে চলে কিন্তু এমনও বহু নজির আছে যেখানে মাতৃকুলের রেখা ধরে চলে। কথিত আছে, আরাকানের মগেরা মাতৃকুল ধরে চলে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বেলায় এটা ব্যতিক্রম। তবে যাই হোক, বাড়ির ছাগল, গরু–বাছুর, জমি পিতার নিকট থেকে পুত্র এবং অলঙ্কারাদি, মণিমুক্তা, মেয়েদের পোশাক, সূতা কাটা ও বয়নের যন্ত্রপাতি , মুরগী, শূকর, মাতার

পিতৃ বংশধারার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পুরুষরাই পরিবারের মেরুদণ্ডরূপে বিরাজ করে। মেয়েরা যদিও জন্মসূত্রে পিতৃবংশের পরিচয় বহন করে কিন্তু বিয়ের পর তারা আর সেই বংশের সঙ্গে জড়িত থাকে না, তখন তারা স্বামীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেবলমাত্র অবিবাহিতা বোনেরা ভাইদের সঙ্গে থাকে—অবশ্য এই দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। অপর পক্ষে স্ত্রী স্বামীর পরিবারেরই একজন হয়ে দাঁড়ায়। এক পরিবারের সব পুরুষ সদস্য একসঙ্গে থাকে না (অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে)। যখন ছেলে সাবালক হয় তখন সে তার পিতার গৃহ ছেড়ে চলে গিয়ে নিজের বাড়ি তৈরি করে। এটা অবশ্য ছেলের বিয়ের সময়ই হয় কিন্তু তারও আগে নিজের জন্য ঘর তৈরি করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যদিও ভাইয়েরা একত্রে না থেকে আলাদা আলাদা থাকে, কিন্তু সাধারণত তারা গ্রামের একই অংশে পাশাপাশি ঘর তৈরি ক'রে থাকে। এই নৈকট্য এবং গোষ্ঠী বন্ধনের প্রতি স্বীকৃতিই তাদের সংহতি রক্ষা ক'রে আসছে। পরিবারের সংহতি রক্ষার ব্যাপারে এটা সহায়ক হলেও আর্থিক স্বার্থের প্রশ্নে এর কোনো প্রভাব নেই। কারণ প্রত্যেক যুবক আলাদা ঝুমভূমি নিয়ে তার নিজস্ব জীবন শুরু করে। সেই ঝুমভূমির সে নিজেই কর্তা। পরে পিতার মৃত্যুর পর সে সমতল ভূমিরও অংশ পায় এবং তার নিজস্ব সম্পত্তির সঙ্গে এটা যোগ হয়। চাকমা, তনচাঙ্গিয়া অথবা মগ উপজাতির মধ্যে সচরাচর কোন একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায় না। অবশ্য এরও ব্যতিক্রম আছে কিন্তু সেগুলি খুবই বিরল উদাহরণ। সাধারণত এক ব্যক্তির পরিবার পিতামাতা ও অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে গঠিত। এই 'একক পরিবারের' নিয়মই স্বাভাবিকভাবে সমস্ত পাহাড়িয়া লোকদের উপর প্রযোজ্য।

অন্যান্য উপজাতির মত ম্রোরাও পিতৃধারায় পরিচিত হয়ে থাকে এবং পুরুষেরা পরিবারের মেরুদণ্ডস্বরূপ। মেয়েরা বিয়ের পর এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে চলে যায়। যদিও অন্যত্র একান্নবর্তী পরিবার বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু ম্রোদের ভিতর এই একান্নবর্তী পরিবারেরই প্রচলন দেখা যায়। তারা ভাইয়েরা এক সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে এবং একই সঙ্গে তাদের এজমালী জমি চাষ করে।

পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের বাসভূমি হ'ল পিতৃপুরুষের ভিটা। কনে বিয়ের পরে তার শ্বশুরের গ্রামে চলে এসে স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধে। তবে চাকমা ও মগদের মধ্যে এ প্রথার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। কনের যদি কোনো ভাই না থাকে বা ছোট থাকলে কনের বাবা

নিকট থেকে কন্যা পায়। সাধারণত জ্যেষ্ঠপুত্রই প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়, অবশ্য যদি না সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বড় ছেলে চলে গেলে সকলের ছোট ছেলে উত্তরাধিকারী হয়, কারণ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র অন্যান্য পুত্রের চেয়ে বেশি অনুগ্রহ পায়।—Levi-Strauss. *Kinship System* p.50. Bernot একই ধরনের মত পোষণ করেন (ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ক'রে জেনেছি)।

জামাইকে তার পরিবারের সঙ্গে বাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সেসব ক্ষেত্রে বাসভূমি হবে 'মাতৃ অঞ্চলে' বা মাতৃভিটায়। শ্বশুরের যদি সারাজীবন ছেলে না হয় কিংবা ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে যত দিন সে বড় না হয় ততদিন জামাই শ্বশুরের একান্নবর্তী পরিবারের একজন হয়ে থাকে। শ্বশুর বাড়িতে এই ধরনের বসবাসের আর এক প্রথাও রয়েছে উপজাতীয় লোকদের মধ্যে, তা হ'ল যদি জামাতা এককালীন কনে-পণ না দিতে পারে তবে যত দিন তা শোধ না করা হয় ততদিন কনে তার বাবার পরিবারে বাস করে এবং কনে-পণ শোধ হলে বর ও কনে বরের বাবার বাড়িতে চলে যায়। এমন ক্ষেত্রে বাসভূমিকে বলা হয় মাতৃ-পিতৃ অঞ্চল বা ভিটা।[১১]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতা-পিতার উদ্যোগেই পুত্রের বিবাহ হয়। ছেলের বাবা সবসময়ই সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধানে থাকে। পাত্রী পছন্দ হলে ঘটক পাঠিয়ে পাত্রীপক্ষের মতামত জানা হয়—অবশ্য এসব ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতকেও উপেক্ষা করা হয় না। পাত্রীর পিতার কাছে পাত্র উপহার সামগ্রী ও কিছু টাকা পাঠায়, এর বিনিময়ে পাত্রীর পিতা ইচ্ছা করলে মেয়েকে কিছু গহনা ও জামাইকে কিছু যৌতুক যেমন—সাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি দিতে পারে।

কতকগুলি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে। যেমন, চাকমাদের ভিতরে দেখা যায় যে, বদমেজাজ, দুরারোগ্য ব্যাধি, ব্যভিচার প্রভৃতির জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় ঘোষণা করে সর্দার বা প্রধান (Chief)। উপজাতিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বহুপত্নীক পুরুষও আছে। তবে সে রকম পুরুষের সংখ্যা খুব কম বললেই চলে (ম্রোদের ভিতর বহুবিবাহ দেখা যায় না)। বর্তমান বোমাং সর্দারের (Chief) ছয় জন স্ত্রী আছে এবং তাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যাও প্রায় ৫০। যদিও স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করার রীতি আছে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। উপজাতিদের ভিতর বাল্যবিবাহের প্রচলন নাই এবং বিবাহের বয়োসীমা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১২]

উপজাতিদের ভিতর হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক সবার সঙ্গে চলে না। যেমন, তনচাঙ্গিয়াদের মধ্যে একজন পুরুষ তার শাশুড়ি, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এবং ভাগিনেয় বা ভাইপোর স্ত্রীকে

---

১১. চাকমা প্রসঙ্গে Levi-strauss এর বর্ণনা মতে "বিয়ে সাধারণত পিতৃভিটাতে বসতির ধারা বজায় রাখে তবে কোন পিতা যদি কন্যাকে অত্যধিক স্নেহ করেন তবে সে ক্ষেত্রে তিনি বিয়ের পর প্রথম ২/১ বৎসর জামাই শ্বশুরালয়ে থাকবে কাজ কর্মে অংশ নেবে এই শর্তে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে কনে পণ তুলনামূলকভাবে কম হয়।" দ্রষ্টব্য Levi-struss. *Kinship systems* P. 43.

১২ যখন কোনো বালক উপযুক্ত হয় তখন সে তার নিজস্ব ঝুমভূমি তৈরি করে। এটাই বয়প্রাপ্তির লক্ষণ এবং এ উপলক্ষে ছেলের মাতা-পিতা আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত ক'রে খাওয়ায়। বাল্য-বিবাহ চাকমা ও অন্যান্য পাহাড়িয়া লোকদের মধ্যে দেখা যায় না। বিয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়সীমা নাই। অনেকেই অবশ্য ২৪/২৫ বছর বয়সের আগে বিয়ে করে না, তবে এই বয়সের পরে অবিবাহিত লোক বড় একটা দেখা যায় না।-Lewin,p.10.

এড়িয়ে চলে অর্থাৎ কথাবার্তা বা কোনো কিছু দেওয়া-নেওয়ার কাজ তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে চালায়। চাকমাদের ভিতর আত্মীয়স্বজনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা--'খেলুয়া' ও 'গোরহা'।

খেলুয়া বলতে সমপর্যায়ের যেমন—ভাই, চাচাত-মামাত ভাই, দাদা-দাদি, নাতি-নাতনী প্রভৃতি এবং 'গোরহা' বলতে ভিন্নতর পর্যায়ের যেমন—বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, চাচা-চাচী, মামা-মামী, ভাগ্নে-ভাগ্নি প্রভৃতিকে বোঝায়। খেলুয়া আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা চলে, কিন্তু 'গোরহা' আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তা চলে না।[১৩]

সম্পর্কের তারতম্যহেতু পরস্পরের মধ্যে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখার যে রীতি প্রচলিত আছে তার অর্থ এই নয় যে, তাদের একজন অপরের নিকট থেকে নিজেকে লুকিয়ে বা আড়াল করে রাখবে বরং এর অর্থ কোন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে নিছক ভাব-বিনিময় বা যোগাযোগ রক্ষা করা।[১৪]

---

১৩. তথ্য সরবরাহকারী : চাকমা রাজা, ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৯৫৭ সন। ঠাট্টা-তামাসা প্রসঙ্গে Bernot নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেন : "স্ত্রীর ছোট বোনের সঙ্গে স্বামীর এবং স্বামীর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীর ঠাট্টা-তামাসা চলে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্যালিকাকে বা স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরকে বিয়ে করা যায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কোনো স্ত্রীলোক স্বামীর বড় ভাইকে বিয়ে করতে পারে না। তারা পরস্পরের সঙ্গে কদাচিৎ কথা বলে এবং উভয়েই সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলে।"

১৪. পার্বত্য উপজাতিদের সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে আরো তথ্য জানবার জন্য পরিশিষ্ট-১ দেখুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
রাজস্ব সংগ্রহ

আমরা দেখেছি যে, পার্বত্য অঞ্চলে দুইটি পরিপূরক প্রশাসনিক গঠন-ব্যবস্থা চলে আসছে— যা এই অঞ্চলকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। একটি হ'ল জেলা ও মহকুমার ধাপ এবং অপরটি হ'ল গ্রাম থেকে মৌজা ও পরে সার্কেলের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন এই দুই ধরনের প্রশাসনিক গঠন-ব্যবস্থা? রাজস্ব আদায়ের জন্যই এই ধরনের ব্যবস্থা অর্থাৎ সরকার কর্তৃক উপজাতিদের উপর যে কর ধার্য হয়েছে তা আদায়ের জন্যই এই দুই রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে।

বর্তমানে এই অঞ্চলে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান তা বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছে।

পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে আমাদের (ইংরেজ) আচরণের সবচেয়ে পুরানো বিবরণ পাই ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখিত চট্টগ্রামের সর্দার বা প্রধানের চিঠিতে। চিঠিতে সর্দার লিখেছেন : "আমি যতদিন থেকে এখানে আছি ততদিন থেকে 'রনা খান' নামক এক পর্বতবাসী 'তুলা-খামারের' জন্য কিছু খাজনা কোম্পানিকে দিয়ে আসছে। এটা সে খাজনাদানকারী কৃষকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় ক'রে তাদের বিদ্রোহী ক'রে তুলছে। কয়েকমাস পূর্বে জমির মালিকরা কৃষকদের উপর নানা কর আরোপ ও আদায় ক'রে তাদেরকে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছিল। এই সকল করের কোনো গুরুত্ব বা আইনসঙ্গত মূল্য নাই।" [পরে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল।] নিকট প্রতিবেশী এক শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারের ফলে প্রধানেরা ক্রমে ক্রমে আমাদের কর্তৃত্বাধীনে আসেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে সমতলভূমির বাসিন্দাদের সঙ্গে পাহাড়িয়া লোকদের ব্যবসায়- বাণিজ্যের সুবিধা লাভের জন্য প্রত্যেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সর্দার বা প্রধান উপহারস্বরূপ বাৎসরিক কিছু কর চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়কারীকে দিতেন। প্রথমে এই টাকার কোনো নির্ধারিত পরিমাণ ছিল না, পরে ধীরে ধীরে এর পরিমাণ নির্ধারিত ও সীমিত করা হয়। তখন আর সেটা উপঢৌকন না হয়ে রাষ্ট্রের খাজনাতে রূপ নেয়।[১]

---

১. হাচিনসনের বই এর ৮-৯ পৃ. দ্রষ্টব্য। যা হোক রাজস্ব আদায় করা ছাড়াও প্রশাসনের অন্যান্য বিশেষাধিকার (Prerogatives) আছে।

ধারা ৪২ক. বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আইন :

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমে একটি রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে ছিল এবং রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়কারী নিয়ন্ত্রণ করতেন। জেলা শাসকের দফতর (Collectorate) সেই পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং তার অধিবাসীদের জীবনধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাতে রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। পার্বত্য অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়কের (Superintendent) জেলা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকাতে এ বিষয় অনুভূত হ'ল যে, বেশিরভাগ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং অল্প অল্প ক'রে সমস্ত রাজস্ব পরিচালনা তাঁর হাতে এসে পড়ল এবং জেলাটি রাজস্ব ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে চট্টগ্রামের জেলা শাসকের দফতর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ১৮৬০

ডেপুটি কমিশনারের, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় চাকুরী করেন এমন সব গেজেটেড অফিসারের, উপজাতীয় প্রধান, মাতবর অথবা ডেপুটি কমিশনারের মনোনীত কোনো অফিসারের প্রয়োজনের চাহিদা মোতাবেক প্রাদেশিক সরকারের আদেশক্রমে যারা সরকারি চাকুরী করেন, বাজারের দোকানদার এবং স্কুল শিক্ষক ছাড়া ১৮ বৎসরের কম নয় এবং ৪৫ বৎসরের বেশি নয় এমন সব প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত মজুরী হারে শ্রম দিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবে।"

"যখন মজুরী ভিত্তিক স্বেচ্ছাশ্রম পাওয়া যাবেনা তখন উপধারা (i) আওতায় কেবলমাত্র নিম্নলিখিত কারণে শ্রম দাবি করা যেতে পারে।

(ক) সরকারি গুদাম স্থানান্তরিত করার সময়।

(খ) চটগ্রাম পার্বত্য এলাকায় সরকারি কর্মকর্তার, প্রধানের অথবা হেডম্যানের ক্যাম্পের মালামাল বা ক্যাম্পের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বহন করার জন্য।

(গ) সরকারি কর্মকর্তার অথবা প্রধানের সরকারি কাজে ভ্রমণের সময় অন্যত্র তাবু খাটানোর জন্য। (ঘ) জনসাধারণের কাজের জন্য যেমন সড়ক, রাস্তা, পুল, তৈরি ও মেরামতের জন্য অথবা বনাঞ্চলের সীমানা পরিষ্কার করার জন্য। যদি এই সব কাজ করতে মানুষের বসত ভিটা বা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে হয় তবে ডেপুটি কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে এমন শ্রমের জন্য শ্রমিক দাবি করা যাবে না।

(ঙ) উপরোল্লিখিত যে কোনো কাজের জন্য যদি নৌকার মাঝি দরকার হয়।

ধারা ৪০. প্রধান ও মাতবরদের প্রশাসনিক ক্ষমতা।

মৌজা মাতবরগণ তাদের মৌজা এলাকার বাসিন্দাদের আনীত সব ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করবে। উপজাতিদের সামাজিক প্রথার সাথে সমন্বয় রেখে এই সব বিরোধসমূহের বিচার করবে। তাদের ২৫.০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করার ক্ষমতা আছে, উপরন্তু ডেপুটি কমিশনারের ঐ বিষয়ে কোনো আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখতে পারবে। প্রধানগণ (chief) মাতবরদের অনুরূপ তাদের খাস মৌজার বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি করবে এবং মাতবরগণ নিজে বা লোক মারফত যে সমস্ত বিরোধ সিদ্ধান্তসহ প্রেরণ করবে সেগুলিও তারা বিচারপূর্বক নিষ্পত্তি করবে।

ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে উপজাতীয় মামলায় প্রধানগণ জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০.০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করতে পারবে। তাদের বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ার ডেপুটি কমিশনারের সাধারণ পুনরধ্যয়নমূলক বা সংশোধনমূলক বিচার ব্যবস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রাধীন।" *Chittagong Hill Tracts Manual* পৃ. ৩৪ ও পৃ. ৩১ দ্রষ্টব্য।

সনের ২২তম আইন (Act XXII) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলাতে পরিণত হয়। এবং এর সীমানা নির্ধারিত হয় ১৮৬৩ সালের আইনে (Act of 1863)।[২]

রাজস্ব আদায়ের এই পদ্ধতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে লিপিবদ্ধ করা হলেও এটা কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় প্রথার উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠে। ইংরেজ সরকার তাদের সুবিধামত্ এই প্রথার প্রয়োগ করেছে। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে এই অঞ্চলে ভারতীয় প্রথার মূল কতটা গভীরে ছিল।[৩]

কেমন ক'রে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় প্রথায় রাজস্ব সংগ্রহ করা হত তা সপ্তদশ শতকের একজন বিখ্যাত ফরাসী পর্যবেক্ষকের নিম্নলিখিত বিবৃতি থেকে বোঝা যায় : "রাজাই হলেন সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি সামরিক কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে

---

২. হাচিনসনের বইয়ের ৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য। স্পষ্টত হাচিনসনের সংক্ষিপ্তসার লিউনের (Lewin) বর্ণিত নিম্নলিখিত বর্ণনায় আরও পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে :

"১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উপজাতিদের উপর আমাদের কোন প্রভাব বা শাসন ছিল না। যা হোক প্রতিবেশি শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত সরকার (বৃটিশ ইন্ডিয়া) স্বভাবতই ধীরে ধীরে প্রধানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় প্রধানেরা সমভূমির লোকদের সঙ্গে পাহাড়িয়াদের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা লাভের জন্য চট্টগ্রাম রাজস্ব আদায়কারীকে কমবেশি কিছু বার্ষিক উপঢৌকন দিত, পরে সেটা রাষ্ট্রের নির্ধারিত স্থায়ী রাজস্বে রূপ নেয়।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমরা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর কোনো হস্তক্ষেপ করি নাই। সেই বৎসরই স্বাধীন 'কুকি' গোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী টিপারা জেলায় বৃটিশ প্রজাদের হত্যা করে। এই আক্রমণ এত সঙ্ঘবদ্ধ ও ব্যাপক ছিল যে তা ইংরেজ সরকারকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুললো। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পার্বত্য উপজাতিদের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট (Superintendent) নিযুক্ত করা হলো। সেই সময় হ'তে পার্বত্য এলাকার নামকরণ করা হ'ল পার্বত্য চট্টগ্রাম (Hill Tracts of Chittagong)। এই আকস্মিক আক্রমণ পার্বত্য এলাকার উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থানরত পাহাড়িয়াদের কে কোনঠাসা করে দিয়েছিল, অতএব ১৮৬১ সালের ২৭শে জানুয়ারি মেজর র‍্যাবানের অধিনায়কত্বে এক অভিযান পাহাড়িয়া এলাকায় পরিচালনা করা হয় এবং দায়ী প্রধান উপজাতিগণকে শাস্তি দেওয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন উপজাতিদের তত্ত্বাবধান করা এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই উদ্দেশ্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হ'ল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সরকারি পদবি "পার্বত্য উপজাতিদের সুপারিনটেনডেন্ট" এর পরিবর্তে "পার্বত্য অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার" রাখা হয় এবং তার উপর সমস্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। একই সময়ে জেলাকে কয়েকটি সাব ডিভিশনে বিভক্ত করে প্রত্যেক সাবডিভিশনে ভারপ্রাপ্ত একজন করে অধীনস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। (Lewin এর বই, পৃ. ২২ দ্রষ্টব্য)

৩. হিন্দুস্থান সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে "মার্ক্স" তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষাগত রচনাশৈলীতে ভারতীয় ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করেন :

"এশিয়াতে মান্ধাতার সময় থেকে তিন রকম সরকারি দফতর চলে আসছে, একটা হ'ল 'রাজস্ব' বা আভ্যন্তরীণ লুঠতরাজ, অপরটি হ'ল 'যুদ্ধ' বা বহির্লুঠতরাজ এবং অন্যটি 'জনহিতকর' কাজ।"--Marx, *Historical Writings*. People's Publishing House, 1944, VoL.I,p.93.

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমে একটি রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে ছিল এবং রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়কারী নিয়ন্ত্রণ করতেন। জেলা শাসকের দফতর (Collectorate) সেই পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং তার অধিবাসীদের জীবনধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাতে রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। পার্বত্য অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়কের (Superintendent) জেলা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকাতে এ বিষয় অনুভূত হ'ল যে, বেশিরভাগ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং অল্প অল্প ক'রে সমস্ত রাজস্ব পরিচালনা তাঁর হাতে এসে পড়ল এবং জেলাটি রাজস্ব ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে চট্টগ্রামের জেলা শাসকের দফতর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ১৮৬০

ডেপুটি কমিশনারের, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় চাকুরী করেন এমন সব গেজেটেড অফিসারের, উপজাতীয় প্রধান, মাতবর অথবা ডেপুটি কমিশনারের মনোনীত কোনো অফিসারের প্রয়োজনের চাহিদা মোতাবেক প্রাদেশিক সরকারের আদেশক্রমে যারা সরকারি চাকুরী করেন, বাজারের দোকানদার এবং স্কুল শিক্ষক ছাড়া ১৮ বৎসরের কম নয় এবং ৪৫ বৎসরের বেশি নয় এমন সব প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত মজুরী হারে শ্রম দিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবে।"

"যখন মজুরী ভিত্তিক স্বেচ্ছাশ্রম পাওয়া যাবেনা তখন উপধারা (i) আওতায় কেবলমাত্র নিম্নলিখিত কারণে শ্রম দাবি করা যেতে পারে।

(ক) সরকারি গুদাম স্থানান্তরিত করার সময়।

(খ) চটগ্রাম পার্বত্য এলাকায় সরকারি কর্মকর্তার, প্রধানের অথবা হেডম্যানের ক্যাম্পের মালামাল বা ক্যাম্পের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বহন করার জন্য।

(গ) সরকারি কর্মকর্তার অথবা প্রধানের সরকারি কাজে ভ্রমণের সময় অন্যত্র তাবু খাটানোর জন্য। (ঘ) জনসাধারণের কাজের জন্য যেমন সড়ক, রাস্তা, পুল, তৈরি ও মেরামতের জন্য অথবা বনাঞ্চলের সীমানা পরিষ্কার করার জন্য। যদি এই সব কাজ করতে মানুষের বসত ভিটা বা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে হয় তবে ডেপুটি কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে এমন শ্রমের জন্য শ্রমিক দাবি করা যাবে না।

(ঙ) উপরোল্লিখিত যে কোনো কাজের জন্য যদি নৌকার মাঝি দরকার হয়।

ধারা ৪০. <u>প্রধান ও মাতবরদের প্রশাসনিক ক্ষমতা।</u>

মৌজা মাতবরগণ তাদের মৌজা এলাকার বাসিন্দাদের আনীত সব ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করবে। উপজাতিদের সামাজিক প্রথার সাথে সমন্বয় রেখে এই সব বিরোধসমূহের বিচার করবে। তাদের ২৫.০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করার ক্ষমতা আছে, উপরন্তু ডেপুটি কমিশনারের ঐ বিষয়ে কোনো আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখতে পারবে। প্রধানগণ (chief) মাতবরদের অনুরূপ তাদের খাস মৌজার বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি করবে এবং মাতবরগণ নিজে বা লোক মারফত যে সমস্ত বিরোধ সিদ্ধান্তসহ প্রেরণ করবে সেগুলিও তারা বিচারপূর্বক নিষ্পত্তি করবে।

ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে উপজাতীয় মামলায় প্রধানগণ জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০.০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করতে পারবে। তাদের বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ার ডেপুটি কমিশনারের সাধারণ পুনরধ্যয়নমূলক বা সংশোধনমূলক বিচার ব্যবস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রাধীন।" *Chittagong Hill Tracts Manual* পৃ. ৩৪ ও পৃ. ৩১ দ্রষ্টব্য।

সনের ২২তম আইন (Act XXII) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলাতে পরিণত হয়। এবং এর সীমানা নির্ধারিত হয় ১৮৬৩ সালের আইনে (Act of 1863)।[২]

রাজস্ব আদায়ের এই পদ্ধতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে লিপিবদ্ধ করা হলেও এটা কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় প্রথার উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠে। ইংরেজ সরকার তাদের সুবিধামত এই প্রথার প্রয়োগ করেছে। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে এই অঞ্চলে ভারতীয় প্রথার মূল কতটা গভীরে ছিল।[৩]

কেমন ক'রে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় প্রথায় রাজস্ব সংগ্রহ করা হত তা সপ্তদশ শতকের একজন বিখ্যাত ফরাসী পর্যবেক্ষকের নিম্নলিখিত বিবৃতি থেকে বোঝা যায় : "রাজাই হলেন সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি সামরিক কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে

---

২. হাচিনসনের বইয়ের ৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য। স্পষ্টত হাচিনসনের সংক্ষিপ্তসার লিউনের (Lewin) বর্ণিত নিম্নলিখিত বর্ণনায় আরও পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে :

"১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উপজাতিদের উপর আমাদের কোন প্রভাব বা শাসন ছিল না। যা হোক প্রতিবেশি শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত সরকার (বৃটিশ ইন্ডিয়া) স্বভাবতই ধীরে ধীরে প্রধানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় প্রধানেরা সমভূমির লোকদের সঙ্গে পাহাড়িয়াদের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা লাভের জন্য চট্টগ্রাম রাজস্ব আদায়কারীকে কমবেশি কিছু বার্ষিক উপঢৌকন দিত, পরে সেটা রাষ্ট্রের নির্ধারিত স্থায়ী রাজস্বে রূপ নেয়।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমরা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর কোনো হস্তক্ষেপ করি নাই। সেই বৎসরই স্বাধীন 'কুকি' গোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী টিপারা জেলায় বৃটিশ প্রজাদের হত্যা করে। এই আক্রমণ এত সঙ্ঘবদ্ধ ও ব্যাপক ছিল যে তা ইংরেজ সরকারকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুললো। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পার্বত্য উপজাতিদের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট (Superintendent) নিযুক্ত করা হলো। সেই সময় হ'তে পার্বত্য এলাকার নামকরণ করা হ'ল পার্বত্য চট্টগ্রাম (Hill Tracts of Chittagong)। এই আকস্মিক আক্রমণ পার্বত্য এলাকার উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থানরত পাহাড়িয়াদের কে কোনঠাসা করে দিয়েছিল, অতএব ১৮৬১ সালের ২৭শে জানুয়ারি মেজর র‍্যাবানের অধিনায়কত্বে এক অভিযান পাহাড়িয়া এলাকায় পরিচালনা করা হয় এবং দায়ী প্রধান উপজাতিগণকে শাস্তি দেওয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন উপজাতিদের তত্ত্বাবধান করা এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই উদ্দেশ্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হ'ল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সরকারি পদবি "পার্বত্য উপজাতিদের সুপারিনটেনডেন্ট" এর পরিবর্তে "পার্বত্য অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার" রাখা হয় এবং তার উপর সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। একই সময়ে জেলাকে কয়েকটি সাব ডিভিশনে বিভক্ত করে প্রত্যেক সাবডিভিশনে ভারপ্রাপ্ত একজন করে অধীনস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। (Lewin এর বই, পৃ. ২২ দ্রষ্টব্য)

৩. হিন্দুস্থান সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে "মার্ক্স" তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষাগত রচনাশৈলীতে ভারতীয় ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করেন :

"এশিয়াতে মান্ধাতার সময় থেকে তিন রকম সরকারি দফতর চলে আসছে, একটা হ'ল 'রাজস্ব' বা আভ্যন্তরীণ লুঠতরাজ, অপরটি হ'ল 'যুদ্ধ' বা বহির্লুঠতরাজ এবং অন্যটি 'জনহিতকর' কাজ।"--Marx, *Historical Writings*. People's Publishing House, 1944, VoL.I,p.93.

সমপরিমাণ জমি দিয়ে থাকেন। এই মজুরী বা দানকে 'জায়গীর' (jah-ghir) বলা হয়, যেমন, তুরস্কে 'তিমার' (Timar)। 'জায়গীর' শব্দের অর্থ হ'ল বেতনের স্থান অর্থাৎ যেখান থেকে বেতন সংগ্রহ করা হয়। একই রকমভাবে গভর্নরদেরকেও তাঁদের সেনাবাহিনী রাখার জন্য জমি মঞ্জুর বা দান করা হয় এবং শর্ত থাকে যে, জমির উৎপন্ন শস্য থেকে প্রাপ্ত বাড়তি রাজস্বের কিছু টাকা প্রতিবছর রাজার নিকট দিতে হবে। যেসব জমি এভাবে মঞ্জুর বা দান করা হয় না সেগুলি রাজার নিজ পরিবারের এলাকা হয়ে থাকে এবং কদাচিৎ এগুলিকে জায়গীর প্রথায় দেওয়া হয়। এসব এলাকার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়ে থাকে এবং তারাও তাঁকে বাৎসরিক কর দিতে বাধ্য থাকে।"[৪]

বার্নিয়ারের রচনা থেকে এই উদ্ধৃত অংশটি মোগল আমলের ভারত অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে এই উপমহাদেশে বিরাজমান রাজতন্ত্র সম্পর্কিত। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত হওয়ার দরুন এই বর্ণনা এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে এই বর্ণনায় সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার এই অংশে তখনকার রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্পর্কিত সুন্দর একটি ছবি পাওয়া যায়, কারণ এই অঞ্চলে মোগলদের প্রভাব স্বতস্ফূর্তভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। রাষ্ট্র কয়েকজন মনোনীত প্রতিনিধিকে সরকারের নামে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করত। এবং এসব প্রতিনিধি নির্দিষ্ট শর্তাধীনে সংগ্রহের কিছুটা অংশ লাভ করত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজস্ব সংগ্রহ প্রধানত ভারতের রাজস্ব সংগ্রহের সাধারণ নীতির অনুসরণে করা হতো। মূলত প্রধান বা সর্দার রাজস্বের জন্য দায়ী থাকতেন। তাঁর অধীনে ছিলেন দেওয়ান বা উপ-সংগ্রাহক। মনে রাখতে হবে যে পাহাড়িয়া লোকেরা হ'ল উপজাতি। সেখানকার রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা সেখানকার আদিম সমাজের চিরাচরিত রায়তি স্বত্বের সঙ্গে সমন্বয় রেখে করা হয়েছিল।

.....এই (চাকমা) অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা ৪ জন দেওয়ানের হাতে ছিল। তাঁরা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করতেন। অঞ্চলটি চারটি তালুকে বা প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত ছিল এবং দেওয়ানই হলেন তালুকের সর্বেসর্বা।

তিনি তাঁর নির্ধারিত রাজস্ব সর্দার বা প্রধানকে দিতেন এবং পূর্ণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। কেবলমাত্র মৃত্যুদণ্ডাদেশের অনুমোদনের জন্য সর্দারের কাছে পাঠানো হতো। পরে আরও দেওয়ান নিয়োগ করা হয়েছিল যাঁরা সর্দারের কাছ হতে তাঁদের ক্ষমতা কিনে নিয়েছিলেন এবং এভাবে আসল চার দেওয়ানের ক্ষমতা

---

৪. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire*. Oxford University Press. 1914,p.225.

কয়েক শতাব্দী আগে গ্রীক লেখক মেগাস্থানিস উল্লেখ করেন যে—"জমির কর রাজাকে দেওয়া হয় কারণ সমস্ত 'ভারতই রাজার সম্পত্তি এবং কোন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জমি রাখার অনুমতি দেওয়া হয় না।" শচীন্দ্র কুমার মৈত্র কর্তৃক উদ্ধৃত-*Economic life of Northern India in the Gupta period*. 1957,p.15.

মূলত খর্ব করা হয়েছিল। দেওয়ান কর্তৃক নির্ধারিত বাড়িপ্রতি খাজনা ছিল বছরে ৩.০০ বা ৪.০০ টাকা এবং প্রতি সক্ষম ব্যক্তিকে বিনা পারিশ্রমিকে ১৫ দিনের শ্রম দিতে হত বা এর পরিবর্তে ২.০০ টাকা দিলেই চলত। প্রথম উৎপাদিত ফসলের বা ফলমূলের এক-দশমাংশ এবং বন্য কোন শূকর বা গজলা হরিণ নিহত (শিকার) হলে তার পিছনের এক-চতুর্থাংশ 'দেওয়ানের' প্রাপ্য ভেট। দেওয়ান পরিবারে বিবাহের সময় প্রত্যেক বাড়ি থেকে এক টাকা এবং সার্বজনীন ভোজের জন্য কিছু খাবার ও মদ পাঠানো হতো। ফৌজদারি বা দেওয়ানি—যে ধরনের মামলা হোক না কেন তার নিষ্পত্তিকল্পে দেওয়ানের কাছে উভয় পক্ষকেই এক টাকা ক'রে দিতে হতো। যদি কোনো স্ত্রীলোক রূপার গহনা যেমন—অনন্ত, চন্দ্রহার, বাহুবন্ধ প্রভৃতি রাখতে বা পরতে চায় তবে দেওয়ানকে তার জন্য তিরিশ বা চল্লিশ টাকা দর্শনী দিতে হতো। অপর পক্ষে দেওয়ান তাঁর এলাকার প্রত্যেক বাড়ি থেকে আদায়কৃত টাকার অর্ধাংশ সর্দারকে দিতেন। সর্দারের বিয়ের সময় বা তাঁর অব্যবহিত রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের বিয়ের সময় প্রত্যেক দেওয়ানকে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তিগত উপহার দিতে হতো। দেওয়ানরা গহনা-পত্র পরার অনুমতি প্রদানের স্বত্ব এবং উপজাতি সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগের স্বত্ব ক্রয় ক'রে নিতেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য সর্দারের সম্মুখে হাজির হলে প্রতি পক্ষকেই এক টাকা ক'রে দিতে হতো।[৫]

---

৫. Hutchison, পৃ. ২৩-২৪। লিউইন (Lewin) নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থার বর্ণনা করেন :

"তারা সবাই গ্রামে বাস করে এবং 'রোজা' বা গ্রামের মাতবরের মাধ্যমেই খাজনা দেয়। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ের গ্রামগুলি যে সর্দারের অধীন তাকে 'বোমাং' বলা হয়। আরাকানী ভাষায় 'বো' শব্দের অর্থ মাতবর এবং মং শব্দের অর্থ নেতা। এই সর্দারের বাসভূমি 'বান্দরবনে' 'সাঙ্গু' নদীর পাড়ে অবস্থিত। কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাড়ের গ্রামগুলি মং রাজার আধিপত্যের অধীন। এইসব অঞ্চলের প্রতি পরিবার সর্দারদের প্রতি বৎসর ৪.০০ টাকা থেকে ৮.০০ টাকা 'কর' দেয়। অবিবাহিত পুরুষ, ধর্মযাজক, বিধবা, বিপত্নীক এবং যেসব মানুষ চাষ না ক'রে বন্য পশু শিকার করে তারা এই 'কর' প্রদান থেকে রেহাই পায়। এই টাকা প্রদান ছাড়া প্রত্যেক বয়স্ক লোককে বৎসরে তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে সর্দারের নির্দেশে কাজ ক'রে দিতে হয়। ধান এবং তুলার প্রথম ফসল সর্দারকে দিতে হয়। গ্রাম্য 'রোজা' বা মাতবরের পদমর্যাদা তার এই আয় থেকেও বেশি সম্মানজনক। গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারাই সে মনোনীত হয় এবং সর্দার তাকে সেই পদে নিযুক্ত করে যার জন্য সে সর্দারকে 'নজর' প্রদান করে। মাতবরের পদমর্যাদা বংশপরম্পরায় চলে আসে। পিতার নিকট থেকে ছেলে পায়। গ্রামের ছোটখাট কলহগুলি 'রোজা' নিজেই নিষ্পত্তি করে এবং দুই দলের নিকট থেকে কিছু 'ফি' আদায় করে এবং ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে কমবেশি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাতবর সর্দারের নিকট হতে বার্ষিক আদায়কৃত খাজনার কিছু অংশ পেয়ে থাকে।"-- Lewin,p36. দ্রষ্টব্য।

"গোজা ছাড়াও 'দেওয়ান' নামে পরিবারের একজন কর্তা থাকে, যার থেকে মূলত তার গোষ্ঠী উদ্ভূত হয়। 'টুঙ্গিজাইনিয়াদের' মধ্যে এই বংশানুক্রমিক মাতবরকে 'আহুন' বলে। সে পাহাড়ি খাজনা আদায় ক'রে নিজেদের জন্য কিছু অংশ রাখে এবং অবশিষ্ট অংশ সর্দারকে দেয় এবং এর সঙ্গে জমির বাৎসরিক প্রথম ফসলও প্রদান করে। তার বিবাদ মীমাংসা করার অধিকার থাকে এবং এর বাবদ সে কিছু ফিস আদায় করে। দেওয়ানও কেউ কোনো পশু মারলে তার অংশ পায়। 'গোজা' বড় হলে, দেওয়ান কয়েকজন অধীনস্থ কর্মচারী নিযুক্ত ক'রে শাসনকার্য চালায়। এই

পুরোপুরি এই রকমভাবে না হ'লেও কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে এই ব্যবস্থা এখনও দেখা যায়। ১৯০০ সালে ইংরেজ সরকার উপরে বর্ণিত তালুক প্রথার বিলুপ্তি ঘটায় এবং দেওয়ানদের অপসারিত ক'রে সেই স্থানে সর্দার, মাতবর (Headman) ও 'কারবারীর' ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ করে।[৬] কিন্তু তারা খাজনা আদায়কারী দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহের রীতি ঠিকই রেখেছিল। গত দশ বৎসরে বঙ্গদেশে (Bengal) এত পরিবর্তন সত্ত্বেও কেন এই ব্যবস্থা চলে আসছে তা এ থেকেই বোঝা যায়। ১৯০০ সালের পরেও পার্বত্য অঞ্চলে এই পুরাতন পদ্ধতিকে নতুনরূপে রেখে ইংরেজ–প্রশাসন এটিকে প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের অনুরূপ পদ্ধতি হওয়ার ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছে। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সপ্তদশ শতকে আওরঙ্গজেবের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যে প্রচলিত ভূমি রাজস্ব–সংগ্রহ পদ্ধতির চূড়ান্ত বিস্তৃতি ঘটেছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং স্থানীয় আমীর–ওমরাহগণ ও রাজস্ব আদায়কারীগণ যাদের বার্নিয়ার সাহেব কেবলমাত্র সরকারের সম্পত্তির পরিচালক ও রাজস্ব সংগ্রাহক বলে উল্লেখ করেছেন তারাই সাম্রাজ্যের ভূমিকে তাদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত এলাকায় পরিণত করল। বঙ্গদেশে এভাবেই জমিদারি প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবশ্য ইংরেজদের আনীত পাশ্চাত্য মালিকানা ধারণা এর সঙ্গে যুক্ত হলে তা পূর্ণতা পেয়েছিল। এ বিষয়ের সাম্প্রতিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লিখছেন যে :

এককেন্দ্রিক মোগল শাসনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব আদায়কারীরা তাদের ক্ষমতা আরও দৃঢ় করে এবং তাদের কর্তৃত্বাধীন ভূ–সম্পত্তিকে তাদের ব্যক্তিগত এবং বংশগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এককেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্র ক্ষমতার পতনের সময় আমরা দেখতে পাই যে বাংলার রাজস্বপ্রধান মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার এই জমিদারি প্রথার গোড়া পত্তন করেন। এইরূপে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টি চাকলায় (Chaklas) বিভক্ত ক'রে সেইগুলিকে ২৫টি জমিদারি এবং

অফিসারদেরকে 'হেজায' বলা হয়। তাদেরকে খাজনা এবং 'করভি' (বিনা পারিশ্রমিকে কাজ ক'রে) দিতে হয় না কিন্তু প্রতি বৎসর দেওয়ানকে কিছু ধান, বাঁশের এক চোঙ্গা মদ এবং একটা মুরগী দিতে হয়। এই পদবী বংশানুক্রমিক নয়।"—Lewin,p.67-68.

৬. "সাধারণত কারবারীই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা এবং সে একজন বিশিষ্ট সভ্য, যার সঙ্গে অন্যেরা সম্পর্কযুক্ত। মারমা, ম্রো, খাইয়াং ও টিপরাদের অধিকাংশ গ্রামই দুইটি পরিবার নিয়ে সংগঠিত। তারা পরস্পরের সঙ্গে এবং পৃথকভাবে নিজেদের জ্ঞাতি সৃষ্টি ক'রে থাকে। উপরের কর্তাদের সঙ্গে কারবারী গ্রামের পক্ষ হয়ে কথা বলে এবং গ্রামের জনসাধারণের নেতা হিসাবে কাজ করে। মারমা ও চাকমাদের মধ্যে সে–ই বৌদ্ধ মন্দিরের নেতা। প্রায়ই সে নব্য ভাবধারা গ্রহণ ও প্রচলনে আগ্রহী এবং বাঙালি প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে।"—Bernot,p.56.

১৩টি জায়গীরদারীতে পরিণত করেন। এই বন্দোবস্তই বঙ্গদেশে 'জমিদারতন্ত্রের' ক্রমবিকাশের প্রধান পদক্ষেপ এবং তা 'জমা কামাল তুমারী' নামে পরিচিত হয়।[৭]

এটা সেই রূপান্তরই যাতে ইংরেজ শক্তির পূর্ণ উদ্যম কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করেই ইংরেজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে জমিদারেরা ইংরেজ কর্তৃত্বের সময়ই তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। ইংরেজ সরকার খোলাখুলিভাবেই জমিদারদের আইনসঙ্গত স্বত্বাধিকার প্রদান করেছিল। এই খোলাখুলি স্বীকৃতিই বঙ্গদেশে এত দিনের প্রচলিত ভূমি-সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিল। অন্যান্য কারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্রুততার সঙ্গে তা এতদিনের উৎপাদনের কেন্দ্র গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ভেঙ্গে ফেলল। গ্রাম্য সম্প্রদায় এতদিন যে প্রচলিত অধিকার ভোগ ক'রে আসছিল তা ক্রমে ক্রমে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের রূপ নিল। অধিকন্তু, ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থলে বণিক জাতি আসায় পুরাতন সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে এবং ভূসম্পত্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি লাভজনক পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। এটা বঙ্গদেশকে বিভক্তিকরণে আরও ত্বরান্বিত করল।[৮]

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বঙ্গদেশে জমিদারি স্বত্বকে আরও দৃঢ় করেছিল এবং তা ছিল এই প্রদেশকে ধনতন্ত্র (পুঁজিবাদী) শ্রেণীতে রূপান্তরিত করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। ইংরেজ শক্তি তার প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে অন্যান্য বিষয়ের মত 'ভূমির' মালিকানা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধারণা এদেশের প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রবেশ করাল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের উপযোগী একটি উত্তম সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর প্রবর্তন করল। রাজস্ব আদায়কারীর স্থানে নতুন জমিদার শ্রেণীর পত্তন বৃটিশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

ইংরেজ শাসনামলের ভারতীয় সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ইংরেজগণ ভূমি মালিকানা সম্পর্কিত তাদের নিজস্ব ধারণার প্রবর্তন ক'রে পূর্বের ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করল। এখন ইংরেজ কর্তৃক এই নতুন স্বত্বাধিকার-প্রাপ্ত জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইংরেজ বণিক-ধনতন্ত্রবাদ যখন ভারতে বিস্তার লাভ করছিল তখন তা সর্বপ্রথম দেশীয় বেনিয়া ও মুৎসুদ্দিগণের সংস্পর্শে আসে। এরা এই নব্য-ধনতন্ত্রবাদের দালাল হিসাবে কাজ করছিল এবং ইংরেজগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে এই দেশীয় বণিকদের সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে" পুরাতন জমিদার গোষ্ঠীর কোনো সুবিধা হয়নি। বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ধ্বংস ও অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই নতুন ভূমি নীতি তাদের সুবিধার জন্য নয়, বরং দেশীয় ব্যবসাদারদের সুবিধার্থে প্রণয়ন করা হয়েছিল। "ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধিরা ভারতীয় বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। পার্লামেন্টে সমবেত ইংরেজ ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যাতে ভারত হতে জমিদারীতন্ত্র লোপ না

---

৭. নজমুল করীমের-*Changing Society in India & Pakistan*-এর ১০৩-১০৪ পৃ., ১৯৫৬, Oxford Publication দ্রষ্টব্য।

৮. নজমুল করীমের বইয়ের ১০৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

পায়, তার ফলে ভারতীয় পুঁজিশক্তি অন্যপথে রূপ নিল। সামাজিক অর্থনীতিতে বংশগত সামন্ততন্ত্র আগেই সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা হয়েছিল এবং সামন্ততন্ত্রের বন্ধন থেকে ভূমিকে মুক্ত করা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে ভূমিকে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা থেকে মুক্ত ক'রে নব্যসৃষ্ট ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে দেওয়া হলো।"

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক সরকার এক আইন জারি ক'রে পূর্ব পাকিস্তান হতে জমিদারি প্রথার বিলোপ করেছেন। বর্তমানে এই আইন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং জমিদারি অর্থে জমিদারিতন্ত্র সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়েছে। যে ভূ-সম্পত্তি পূর্বে রাষ্ট্রের ছিল তা বৃটিশ শক্তির আমলে 'জমিদাররা' অন্যায়ভাবে দখল করেছিল, বর্তমান সরকার তার নিজের সুবিধার জন্য এই অন্যায়ভাবে দখলীকৃত অধিকার ফিরিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হ'ল পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় সমগ্র ভূ-সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকারী হওয়া। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় তাদের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা এই নতুন আইন প্রণয়ন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নি। বোধহয় মোগল শাসনের প্রভাব হতে দূরে থাকায় জমিদারি শ্রেণীতে এত রদ-বদল হওয়া সত্ত্বেও এখানে তার কোন প্রভাব পড়ে নি এবং সেইজন্য তারা জমিদারি উচ্ছেদ আইন দ্বারাও আক্রান্ত হয়নি। তারা তাদের নিজস্ব রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে বহির্জগতের এত উত্থানপতন হতে দূরে সরে আছে। এখনও তারা ইংরেজ কর্তৃক পুনর্গঠিত সেই পুরাতন রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে।[৯]

সার্কেলে 'সমতলভূমি' ও 'ঝুমভূমি' পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য যে-কোন জমির মত সমতলভূমিও সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু এটা স্থিরীকৃত বা মীমাংসিত ভূমি। যদি কেউ এক খণ্ড সমতলভূমি চাষ করতে চায় তাহলে সাধারণত সে সেটা দখল ক'রে জেলা কমিশনারের (District Commissioner) অফিসে তার দাবিকে তালিকাভুক্ত ক'রে কিছুটা মালিকানা প্রাপ্ত হয়। সে এ জমির খাজনা সরাসরি সরকারকে দেয়। সার্কেল অফিসারেরা (সর্দার ও মাতবর) খাজনা আদায়কারী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে কিন্তু রাজস্ব-আদায় পদ্ধতি যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তা বিশেষত ঝুমভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, পার্বত্য অঞ্চলে ঝুমভূমির এলাকা সমতলভূমির থেকে অনেক বেশি। সর্দার, মাতবর ও কারবারী প্রধানত এই ঝুমভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

---

৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে মোগলরা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নির্ধারণ করা মুস্কিল। ১৯৫১ সনের আদমশুমারীতে জানা যায়-মিঃ মিল (I.C.S)-এর মতে, "তারা (চাকমা) মগ স্ত্রীলোক ও মোগল সৈনিকদের বংশধর। যে মোগলদের কাছে তারা খাজনা দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেকেই সেই মোগলদের ধর্মাবলম্বী হয় এবং ঐ সময়ের সর্দারদেরও মুসলমানী নাম ছিল। তখন হিন্দুধর্মের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক উৎখাত হয়। এটাও জানা আছে যে, 'চাকমা' মুদ্রাতে পারসীয়ান প্রভাব দেখা যায় (সতীশ চন্দ্র ঘোষের "চাকমা জাতি")। অপর পক্ষে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের সর্দারদের নিজস্ব ধরনের কর প্রথা ছিল। এ সমস্ত প্রশ্নের উপর আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

সাধারণত উপজাতীয় লোকদের জমির মালিকানা সম্বন্ধে সঠিক কোনো ধারণা নেই। যদিও তারা জমি ব্যবহার করে কিন্তু সেটা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে না সুতরাং জমির বা ভূমির অধিকারের সঙ্গে তারা যতটা সংশ্লিষ্ট ততটা জমির মালিকানার সঙ্গে নয়। এই অবস্থা পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (অর্থাৎ ঝুমভূমির বেলায় এ অবস্থা খাটে কিন্তু সমতলভূমির বেলায় তারা এটাকে সম্পত্তির একটা অংশ বলে মনে করে)।[১০]

সার্কেলে সর্দারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নিজস্ব তালুক বা ভূ-সম্পত্তি আছে, এটা আর অবশিষ্ট ভূমির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমানে মং সর্দারের নিজস্ব দুই হাজার একর ভূমি আছে। এই রকম তালুক, উত্তরাধিকার নিয়মানুসারে বংশপরম্পরায় পিতা থেকে জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে চলে আসে। সম্পত্তি বা তালুকের সঙ্গে খেতাবও চলে আসে। কিন্তু সার্কেলের অবশিষ্ট ভূমির উপর সর্দারের কোন মালিকানা অধিকার থাকে না। সেইসব ভূমির সে কেবল রাজস্ব-আদায়কারী। মৌজাতে মাতবর এবং গ্রামে কারবারীর ব্যাপারেও ঐ একই নিয়ম খাটে—তাদের কারো নিজস্ব জমি নেই। রাজস্ব বা খাজনা সংগ্রহের জন্য তারা কেবল সর্দারের অধীনস্থ-দালাল। একজন সাধারণ উপজাতীয় লোকেরও নিজস্ব কোন জমি থাকে না, তবে উপজাতীয় রীতি অনুসারে সে যে-কোনো ভূমি যা সে নিজের উপযোগী মনে করে তা অধিকার ক'রে চাষ-আবাদ করতে পারে এবং সেজন্য সে খাজনাও দিয়ে থাকে। সুতরাং ঝুমভূমি যে কেউ পেতে পারে, তবে প্রথমে যে অধিকার ক'রে মাতবরের নিকট তা রেজিস্ট্রি ক'রে নেয় সেটা তারই হয়। বর্ণনানুসারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রই ভূমির সর্বময় কর্তা।[১১]

---

১০. "ঝুমভূমির মালিকানা সমতলভূমির মালিকানার মত নয়। সেখানে কোনো আনুষ্ঠানিক দলিলপত্র বা আইনসঙ্গত খেতাবও নাই। খুঁটি বা লাঠি দ্বারা জমির সীমানা নির্ধারিত হয় এবং সেইটাই অন্য গ্রামবাসীরা মেনে চলে। জমির ফসল নিয়ে বা ফসল চুরির ব্যাপার নিয়ে যদিও বিবাদ হয় কিন্তু অন্যের চাষ করা জমি বা কেউ কোনো জমি চাষ করার মনস্থ করেছে এমন সব জমি দখল করার কেউ চেষ্টা করে না"।—Leucien Bernot,p.53.

"চেংরি উপত্যকা ও সাংগু উপত্যকার নিম্নাংশ সমতলভূমি চাষের উপযোগী। এইসব ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ধরে নেওয়া হয় এবং জমির মালিক জমিদারি খেতাব নেয়। প্রায়ই সে তার স্বত্বকে মাতবর ও কারবারীদের মত প্রশাসনিক ক্ষমতার দ্বারা দৃঢ় করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় ঋণদাতা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সে সর্বদাই ঋণগ্রহিতা ও অনুচরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। যাযাবর জীবন তারা ছেড়ে দিয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত ধনী জমির মালিকরা তাদের বাঁশের ঘরের পরিবর্তে বাঙালি ঠিকাদার (contractor) দ্বারা শক্ত মাটির ঘর তৈরি করাচ্ছে।"-Lucien Bernot,p.53.

একজন প্রজা সরাসরিভাবে গভর্নমেন্টের অধীন এবং সে যে জমির খাজনা দেয় তার চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক ভোগ করার অধিকার পায়, তবে অবশ্য ইজারা দেওয়ার সময় এ রকম কোনো শর্ত থাকলে যে তার অধিকার চিরস্থায়ী বা বংশানুক্রমিক নয় তবে স্বতন্ত্র কথা। (পুনরাধিকার বা পূর্ণপ্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে হলে *Chittagong Hill Tracts Manual*, p.29 দ্রষ্টব্য)।

১১. প্ল্যানিং বোর্ডের দলিল অনুসারে চার হাজার একর জমি ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের আর বাকি সমস্ত জমির একচ্ছত্র মালিক হ'ল সরকার।

ভূমির আয়তন যাই হোক না কেন, প্রতি খণ্ড ঝুমভূমির জন্য কৃষক মাতবরকে বছরে ৬.০০ টাকা দিতে বাধ্য থাকে। মাতবর তার নিজের জন্য দু'টাকা চার আনা রেখে অবশিষ্ট সর্দারকে দিয়ে দেয়। এই তিন টাকা বার আনার মধ্যে সর্দার এক টাকা চার আনা রাষ্ট্রকে দিয়ে থাকেন। সমতলভূমির ক্ষেত্রে এই হার জমির গুণ অনুসারে ধরা হয়, যেমন প্রথম শ্রেণীর ভূমির জন্য একর প্রতি তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমির জন্য একর প্রতি দু'টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভূমির জন্য একর প্রতি এক টাকা।

পার্বত্য অঞ্চলে 'ভূমি' রাজস্বের অপরিহার্য উৎস, কিন্তু তাই বলে এটাই একমাত্র উৎস নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যবসার জন্য জলপথ ব্যবহারকারীকে 'কর' (tax) দিতে হয়, শহরের বাজারের কোন অংশ ব্যবহারের জন্য কর দিতে হয় ইত্যাদি। এই সমস্ত কর সাধারণত 'বাজার চৌধুরী' নামক বাণিজ্যিক কর আদায়কারীর নিকট দেওয়া হয়।[১২]

---

১২ "পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান রাজস্ব হ'ল. উপজাতীয় সর্দারগণ কর্তৃক বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ সরকারকে প্রদেয় কর। এ ছাড়াও জলপথে যেসব প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ সমতলভূমিতে আনা হয় তার উপরও উপ-শুল্ক আদায় ক'রে প্রতি বৎসর সরকারের বেশ কিছু আয় হয়।

সীমান্তে স্বাধীন উপজাতিদের আক্রমণের ভয় থাকায় এ পর্যন্ত বাঙালি বাসিন্দারা এই জেলার বিস্তৃত সমতলভূমি অধিকার ক'রে চাষ-আবাদ করার সাহস পায় নি। তবে সম্প্রতি একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং গত ২/১ বছর ধরে এই জেলার চট্টগ্রাম সীমান্তের অনেক জমি সমতলভূমির বাসিন্দাদের কাছে ইজারা দেওয়া হচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়েই এই জেলার অধিকাংশ স্থান চাষাধীনে আনা হবে এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মতই রাজস্বের প্রধান উৎস হবে ভূমি-কর।"—Lewin.loc.cit p.27.

"কৃষিযোগ্য ভূমি, দোকান-পাট, বাজারের লেন-দেন, তামাক, ঝুমভূমি (কৃষিযোগ্য) প্রভৃতির উপর বিশেষ কর আছে। প্রতি পরিবারের জন্য বাৎসরিক ৬.০০ টাকা খাজনাসহ সামান্য কিছু মজুরির বিনিময়ে দুই দিনের কায়িক শ্রম ধার্য করা হয়েছে। পরিবার-কর্তা ঐ টাকা কারবারীর নিকট দেয় এবং কারবারী সম্পূর্ণ টাকা মাতবরের কাছে দেয়। মাতবর নিজের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$) রেখে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ সার্কেল-প্রধান বা রাজার নিকট দেয়। রাজা এক-তৃতীয়াংশ রেখে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মহকুমা অফিসারের নিকট দেয়, যিনি ঐ টাকা সরকারি কোষাগারে (Govt. Treasury) জমা রাখেন।"—Lucien Bernot-এর বইয়ের ৪৯ পৃ. দ্রষ্টব্য।

মাতবর, সর্দার ও সরকারের মধ্যে খাজনা বণ্টনের যে তথ্য আমি পেয়েছি তা উপরে বর্ণিত মিঃ বার্নটের তথ্য থেকে সামান্য পৃথক। অপর পক্ষে বার্নট দাবি করেন যে, পরিবার প্রতি খাজনা নির্ধারিত হয়—তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই, কেননা ঢাকা Revenue Board-এর নিকট থেকে যে তথ্য আমি পেয়েছি তা হ'ল খাজনা ঝুমভূমির উপর নির্ধারিত হয়, পরিবারের উপরে নয়। "প্রাদেশিক সরকারের কালে কালে নির্ধারিত 'ঝুমকর' ঝুম পরিবার মৌজার মাতবরকে দেয়। ঝুম পরিবার হ'ল একই বাড়ির একান্নভুক্ত সমস্ত লোক যারা একই ঝুমভূমি চাষ করে এবং ফসল ভোগ করে। মাতবর তার ভাগ রেখে বাকি খাজনা সর্দার বা প্রধানকে দেয়।"—*Chittagong Hill Tracts Manual.* Bengal Govt. Press. 1942, p.23 article 42.

রাজস্ব সংগ্রহ সম্বন্ধে আরো তথ্য জানবার জন্য পরিশিষ্ট-১ দেখুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একটি তনচাঙ্গিয়া গ্রাম

উপজাতি—তনচাঙ্গিয়া
মৌজা—মানিকছড়ি (১০টি গ্রাম নিয়ে)
গ্রাম—মদন মাতবরের পাড়া
৩২টি পরিবারের বাস
লোকসংখ্যা–১৪০

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সন।

রাঙ্গামাটি থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি খুব ভোরে আমরা একটা জিপে ক'রে ধূলিধূসরিত ও আঁকাবাঁকা মেঠো পথে রওয়ানা হলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি কমিশনার অফিসের অন্যতম কর্মকর্তা মিঃ প্রিয়দর্শন দেওয়ান যিনি নিজেও একজন চাকমা এবং চাকমা প্রধানের আত্মীয়। তিনি স্নাতক ডিগ্রীধারী এবং আমাদের দোভাষী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে ছিলেন। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর তথ্য সরবরাহকারী এবং আইন–আদালত ও উপজাতীয় রীতি–নীতি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তাঁকে ধন্যবাদ যে তাঁর কাছ থেকে এমন একটি পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছিলাম যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন উপজাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পূর্বেই আমি বলেছি যে রাস্তা আঁকাবাঁকা ছিল। পার্বত্য অঞ্চলে কেবল সরু পথ দেখা যায়। যদি খুব সাবধানে চালানো যায় তবে দুটো জিপ পাশাপাশি অবস্থায় অতিক্রম করানো যায়। রাস্তাটি প্রত্যেকটি ছোট পাহাড়কে ঘেঁষে চলে গেছে। ডাইনে–বায়ে উপরে নিচে যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, ছোট একটি নদী চোখে পড়বেই। পার হওয়ার জন্য নদীর উপর দিয়ে ছোট ছোট কাঠের পুল করা আছে। সাধারণত বর্ষায় এই পুলগুলি ভেঙ্গে যায়। গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে বাঁশের ঝাড় ও পাহাড়ের ঢালে ঝুম ক্ষেত দেখা যায়।

রাস্তার একটি বাঁক ঘোরার আগেই আমাদের থাম্‌তে হ'ল, কারণ রাস্তার ঠিক মধ্যখানে ঘর বানানোর পাথর বোঝাই একটি লরি এক চাকা খোলা অবস্থায় আমাদের রাস্তা বন্ধ করে পড়েছিল। কয়েকজন পাহাড়িয়া লোক পথ চলতে চলতে থেমে গেল এবং দৃশ্যটি লক্ষ্য করল। তারা আমাদের জানাল যে আমরা যে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তা অতি নিকটেই। এই সংবাদ শুনে আমাদের পথপ্রদর্শক ঠিক করলেন যে আমাদের হেঁটে যাওয়াই উচিত। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর মত তিনি একজনকে আমাদের ব্যাগগুলি নিয়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। লোকটি কোনো উচ্চবাচ্য না করে আমাদের ব্যাগগুলি তুলে নিল এবং তার গন্তব্যস্থলের দিকে না গিয়ে আমাদের মদন মাতবরের পাড়ার দিকে নিয়ে চলল।

এই গ্রামের মাতবরের নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে, এবং পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণভাবে এটাই প্রচলিত নিয়ম। আমরা মাতবরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম।

বাঙালিদের বাড়ির মতই এটা ছিল একটা প্রকাণ্ড মাটির ঘর। কিন্তু পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বাড়িগুলি ছিল বাঁশের তৈরি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তুলনামূলকভাবে এই মালিকের জীবনযাত্রার মান অন্য প্রতিবেশীদের চেয়ে উন্নত। জানা গেল যে, মাতবর ঐদিন কোন কার্য উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে গেছেন। রাঙ্গামাটিতে ঐ দিন সাপ্তাহিক বাজার বসে।

আমরা ভিতরে ঢোকার ঘরে কিছুক্ষণ বসলাম। গৃহকর্ত্রী আমাদের চা পান করতে বললেন। তিনি প্রিয়দর্শন দেওয়ানকে আগে থেকেই চিনতেন, কারণ প্রতি বৎসর তিনি এই গ্রামে খাজনা আদায় করতে আসেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী তার এক পুরুষ আত্মীয়কে আমাদের চা পরিবেশন করানোর দায়িত্ব দিয়ে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিতরের দিকে এক কামরার মধ্যে চলে গেলেন।

আমাদের এখানে আসার পর থেকে অনেকটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একের পর এক লোক আসতে লাগল এবং ঘরে ঢুকেই তারা মেঝেতে চুপচাপ বসে পড়ল। তারা আমাদের নীরবে প্রত্যক্ষ করছিল। এদের সংখ্যা কমপক্ষে বার হবে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্থির হ'ল যে, মিঃ জনসন গ্রামটি ঘুরেফিরে দেখবেন আর সমতলভূমি ও ঝুমভূমি পরীক্ষা করবেন এবং আমি এখানে থেকে এদের পারিবারিক গঠন-পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখব।

যারা আমাদের চারিদিকে ঘিরে বসে ছিল তাদের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একজন যুবককে দেখতে পেলাম। নীরব জনতার উদ্দেশ্যে মিঃ প্রিয়দর্শন দেওয়ান যেসব প্রশ্ন করেছিলেন কয়েকবার এই যুবকটি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করে। প্রিয়দর্শন দেওয়ান যুবকটিকে তার বাড়ি দেখানো ও পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য আমাদের উভয়কেই তার বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। স্বভাবসুলভ লজ্জার জন্য প্রথমে সে ইতস্তত করতে লাগল, কিন্তু প্রিয়দর্শন দেওয়ান যখন জোর করতে লাগলেন তখন সে রাজী হ'ল। লোকটির নাম চন্দ্রমোহন, বয়স ২০ বৎসর এবং অবিবাহিত যুবক। গ্রামের রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর যখন তার বাড়িতে উপস্থিত হলাম তখন দেখে অবাক হলাম যে মাতবরের বাড়ির পর তারই একমাত্র মাটির ঘর। এর ব্যাখ্যাও ঐ একই যে এই পরিবার অপেক্ষাকৃত ধনী। বাড়ির কর্তাকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে গেলাম। ঘরটি বেশ প্রশস্ত তবে আলো কিছুটা কম কিন্তু আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক ঠাণ্ডা।

মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে মেঝেতে বসে কৌতূহল সহকারে আমাদের দেখছিল। আমি দোভাষীর মারফত চন্দ্রমোহনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলাম আর নোট-বই হাতে করে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন নকশা আঁকছিলাম। পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ আমি এখানে দেব না—শুধু পর্যবেক্ষণের সাধারণ বর্ণনার মধ্যে আমি সীমিত থাকব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পার্বত্য অঞ্চলের জ্ঞাতি সম্পর্কের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে—তাই নিশ্চয়ই পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে বুঝতে পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হবে না।
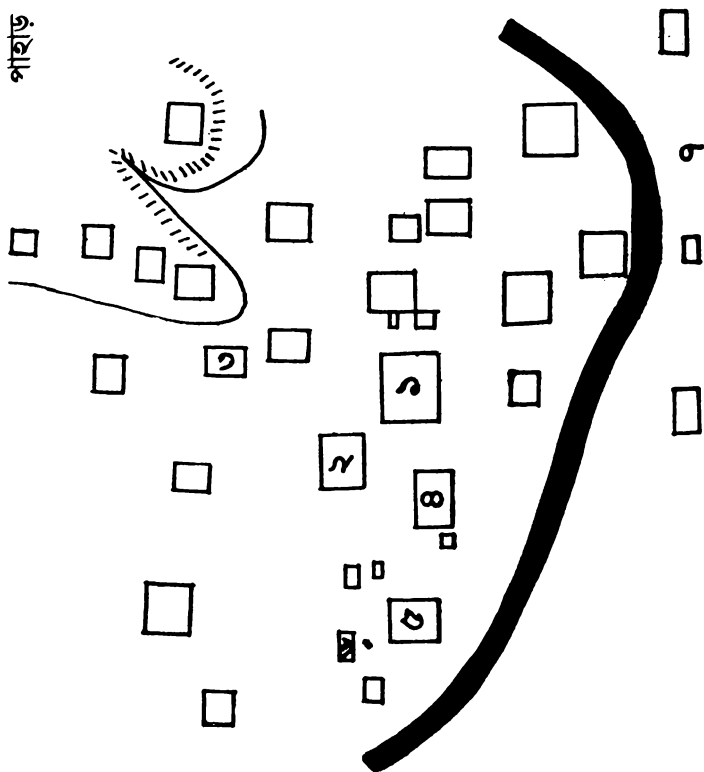
মদন মাতবরের পাড়া

(বেসিল জনসনের আঁকা অনুসারে)

১. চন্দ্রমোহনের বাড়ি—বাবা, মা, বড় ভাই ও তার পরিবার এবং ছোট দুই ভাই এই ঘরে থাকে।
২. বড় বোনের ছেলে, তার বউ এবং মেয়ে (ছোট) থাকে।
৩. বিধবা বোন ও তার ছেলেমেয়ে থাকে
৪. চাচাত ভাই গোপোঙ্গা থাকে।
৫. গোপোঙ্গার ভাই ও তার পরিবার থাকে।
৬. গোপোঙ্গার ভাই ও তার পরিবার থাকে।
৭. তিনজন দূর-আত্মীয়ের ঘর।

☐ অন্যদের ঘর (আত্মীয় নয়)।

~ ছোট একটি নদী।

মদন মাতবরের পাড়া

গোপোঙ্গার বাড়ি (চন্দ্রমোহনের চাচাত ভাই)

৪নং ঘর

১. গোপোঙ্গার কামরা – তার বউ, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে থাকে।
২. বড় মেয়ে ও তার স্বামী থাকে।
  ক. রান্নার স্থান।
৩. বারান্দা।
৪. প্লাটফরম বা ঘরের সামনে উঁচু জায়গা।
৫. ছাগলের ঘর।
  চালের ডোল বা ঝুড়ি।
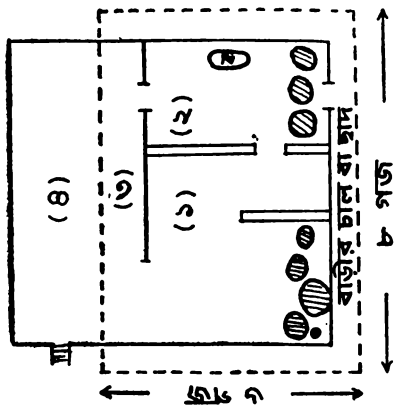
মদন মাতবরের পাড়া

চন্দ্রমোহনের বাড়ি (১নং ঘর)

১. প্রধান কামরা-কাজের ও অতিথির জন্য।
ক—অতিথির বিছানা—অতিথি না থাকলে চন্দ্রমোহন এই বিছানায় ঘুমায়, থাকলে মেঝেতে ঘুমায়।
খ—চাউলের ঝুড়ি বা ধানের ডোল।
গ—বেঞ্চ।

২. বাপের কামরা-মা ও দুই ভাই এর। (২ ও ৪)
ঘ—বিছানা।
ঙ, চ, ছ,—ধানের ডোল।

৩. খাবার কামরা।
জ—রান্নাঘর।
ঝ—যন্ত্রপাতি।

৪. বড় ভাই এর কামরা—ভাবী ও দুই পুত্র (১ ও ২) ১ মেয়ে (৪)।
ঞ—ঘুমানোর মঞ্চ।
ট—ছাদ থেকে ঝুলানো দোলনা।

৫. মুরগীর ঘর।

৬. পুরান রান্নাঘর (এখন ব্যবহৃত হয় না)।
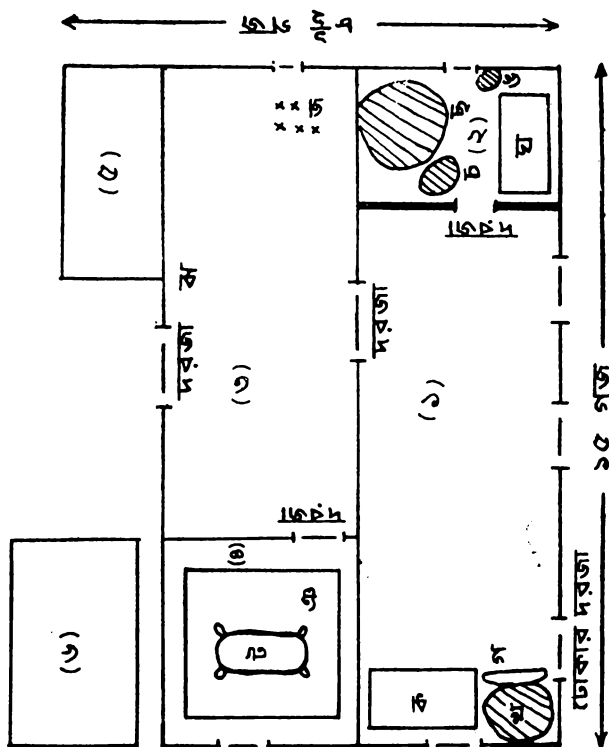
সঙ্গের নক্‌শায় দেখা যায় যে বাড়িতে একটি বড় বা প্রধান কামরা, দু'টি শয়ন–কক্ষ ও একটি রান্নাঘর আছে। সাধারণত প্রধান কামরাতেই সব কাজ হয়, তবে রান্না–বান্না ও কিছু অন্য কাজ রান্নাঘরে হয়। প্রধান কামরাটি 'অতিথি কামরা' হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং সেখানে অতিথিদের জন্য একটি বিছানাও রক্ষিত আছে। অবিবাহিত চন্দ্রমোহন এই বিছানাতে ঘুমায়, যদি কোনো অতিথি আসে তা হ'লে সে মেঝেতে ঘুমায়। শয়ন–কক্ষের একটিতে চন্দ্রমোহনের বাবা (পঞ্চাশ বৎসর), মা, তাদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে (বয়স দুই ও চার বৎসর) থাকে। অপরটিতে তাদের জ্যেষ্ঠপুত্র (৩৫ বৎসর) অর্থাৎ চন্দ্রমোহনের বড় ভাই, তার স্ত্রী, দুই ছেলে (২ ও ১ বৎসর) এবং ১ মেয়ে (৪ বৎসর) থাকে। এই বাড়িতে সর্বমোট একজন 'বৃদ্ধ' মানুষ তার স্ত্রী, চার পুত্র, একজন কন্যা, একজন পুত্রবধু ও তিনজন নাতি–নাতনী থাকে।

এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এটি একটি একান্নবর্তী পরিবার যা কদাচিৎ দৃষ্ট নয়। পিতা এবং তার দুই বয়স্ক পুত্র—একজন বিবাহিত ও অপরজন অবিবাহিত (চন্দ্রমোহন) একত্রে একই জমি চাষ করে। পিতার নামে জমিগুলি রেজিস্ট্রী করা, পুত্রদের নামে পৃথক কোন জমি নাই। এই পরিবারের সমতলভূমি (৬ একর জাগ্রাবিল মৌজাতে ও তিন একর এখানে) এবং ঝুমভূমি দুই-ই আছে। অবশ্য, পিতা সমতলভূমির সবটুকুই নিজের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। মৃদু হেসে চন্দ্রমোহন স্বীকার করল যে, পিতার মৃত্যুর পর এই একান্নবর্তী পরিবার পৃথক হয়ে যাবে এবং তারা সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের (পুরুষদের) মধ্যে সমান ভাগ করে নিবে, যদিও তার বড় ভাই পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে মাটির বড় ঘরটি পাবে। কিন্তু সম্পত্তির ভাগ যারা এই বাড়ীতে বাস করে তারা ছাড়া আরও অনেকে পাবে। প্রকৃতপক্ষে, তার আরেকজন বিবাহিত ভাই নিজের এক পুত্রসহ এই মৌজারই 'বোড়া পাড়া' গ্রামে পৃথক বাড়িতে বাস করে ও পৃথক ঝুমভূমি চাষ করে। মাতা–পিতার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করার জন্য সে নিজেই চলে গেছে। সে ছাড়াও আরও দুই বড় বোন আছে যারা বিয়ের পর অন্যত্র স্বামীর ঘর করছে। কিন্তু মেয়ে বলে তারা এই পরিবারের সম্পত্তির কোনো ভাগ পাবে না।

বিয়ের পর যারা এই মাটির ঘর ছেড়ে গেছে তাদেরকে নিয়ে এই পরিবারের সামগ্রিক কাঠামোটি এইরূপ : একজন বৃদ্ধ ও তার স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, দুই জামাতা, এক পুত্রবধু এবং নয়জন নাতি–নাতনী। তনচাঙ্গিয়া পরিবারের জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে তাতে বিবাহিত কন্যা ও জামাতাকে পরিবারের লোক বলে ধরা হয় না।

এদের পারিবারিক সংগঠনে লক্ষ্য করা যায় যে, একান্নবর্তী পরিবার ব্যতীত, পুত্রেরা যদি নিজেদের আলাদা বাড়ি করে চলে যায় তবে তাদের বাড়িগুলির অবস্থান পিতার

মদন মাতবরের পাড়া

(১১) গোপাঙ্গের বাড়ী
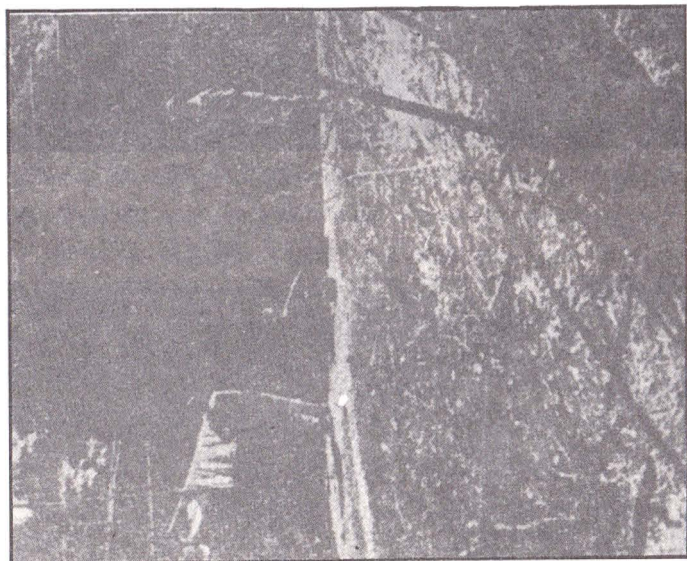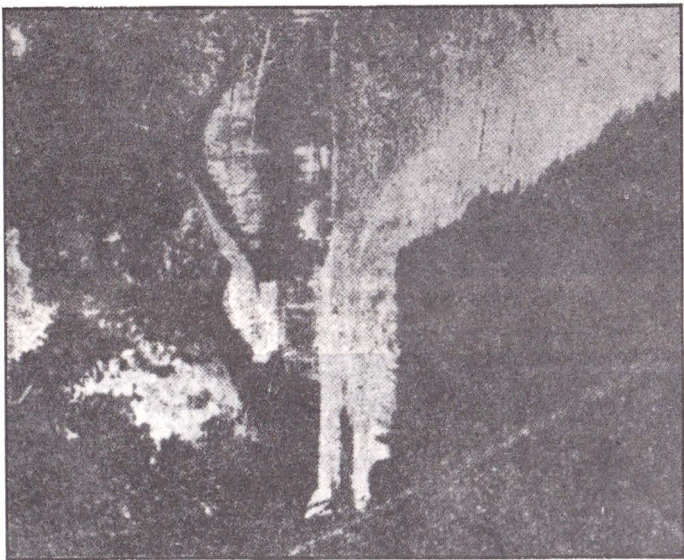
(১২) মাটির ঘর (বামে)
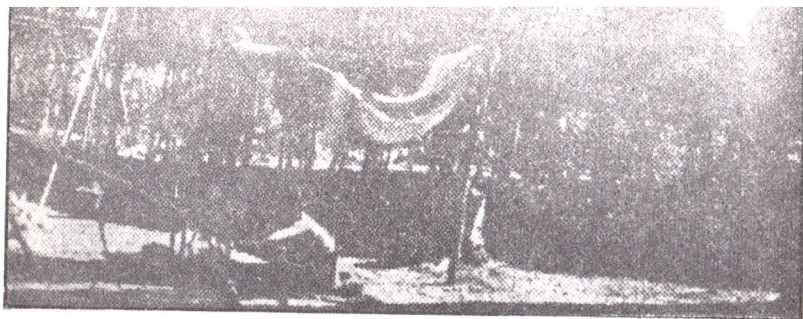
(১৩) হস্ত চালিত তাঁত
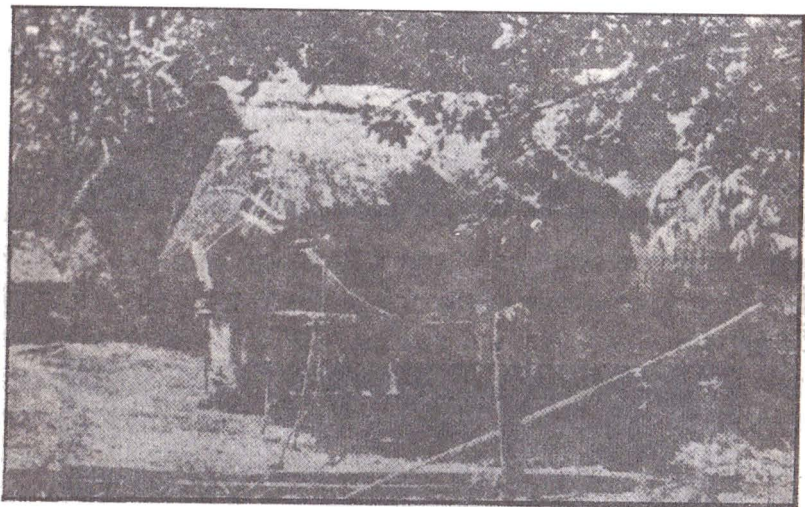
(১৪)

(১৫)

বাড়ির কাছাকাছি হয়ে থাকে। খোঁজ করে দেখা গেল যে, পার্শ্ববর্তী ঘরগুলিতে প্রকৃতপক্ষে এই মাটির ঘরের সদস্যদের আত্মীয়রাই বসবাস করছে। চন্দ্রমোহন দুই বিপরীত দিকে নির্দেশ করে বললো, গ্রামের এক দিকের লোকেরা তার আত্মীয় এবং অন্য দিকের লোকেরা আত্মীয় নয়। চন্দ্রমোহনের ঘরের পরের ঘরেই বাস করছে তার বোনের ছেলে (এই বোন তার বড় ছিল, এখন তার বয়স ৩৪ বৎসর হতো ; সে এবং তার স্বামী উভয়েই মারা গেছে)। সে ১৯ বৎসর বয়সের যুবক। তার স্ত্রী এবং একটি শিশুকন্যা আছে। একটু দূরেই চন্দ্রমোহনের অন্য এক বোন থাকে, বয়স তার ৩১ বৎসর। তিন পুত্র ও দুই কন্যাসহ সে বিধবা। এই আঙ্গিনারই অন্য এক বড় ঘরে থাকে চন্দ্রমোহনের চাচাত ভাই। তিনি তার স্ত্রী এবং এক পুত্র ও এক বিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে এই ঘরে বাস করেন। তাঁর অপর দুই কন্যা বিয়ের পর এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এর পিছনের দিকে দুই ঘরে তার দুই ভাই পরিবার নিয়ে থাকে ; এবং আরো কিছুটা দূরের তিনটি ঘর দূর-আত্মীয়দের।

চন্দ্রমোহনের পরিবারকে যদি সামগ্রিকভাবে পরিবারের উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় এবং গ্রামের এই নমুনাকে যদি স্বাভাবিক গণ্য করা হয় তবে লক্ষ্য করা যাবে যে, পুত্রদের বিয়ের ’পর পরিবার বিভক্ত হয়ে যায়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বাসগৃহের অবস্থান কাছাকাছি হয়ে থাকে। ফলে দেখা যাবে যে পিতার দিকের পূর্বপুরুষদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকজন কমবেশ গ্রামের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে। এইভাবে একটি গ্রাম আত্মীয়-স্বজনদের কতিপয় দলে বিভক্ত।

আরও একটি কারণ আত্মীয়-স্বজনদের একটি বিশেষ স্থান জুড়ে বসবাস করার প্রবণতাকে জোরদার করেছে। তা হ’ল এই যে, তথ্য সংগ্রহের সময় আমরা যেসব লোকের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাদের মতে এই গ্রামে শতকরা পঞ্চাশ জন স্ত্রী এই গ্রামেরই মেয়ে এবং বাকী পঞ্চাশ জন অন্যান্য স্থানের। তাও আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশের গ্রামের মেয়ে। এতে একটা সুবিধা এই যে মাতাপিতা উপযুক্ত পুত্রবধূ বিচার করে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। যেহেতু বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই গ্রামগুলি সাধারণত পারস্পরিক নির্ভরশীল সেহেতু মদন মাতবরের পাড়ার মেয়েদের সঙ্গেও প্রতিবেশী গ্রামের ছেলেদের বিয়ে হয়ে থাকে এবং যেহেতু কয়েক পুরুষ ধরে এই বৈবাহিক সম্পর্ক চলে আসছে সেহেতু এক গাঢ় পারিবারিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা বরাবর গ্রামের ভিতরে ও বাইরে গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থা স্থানীয় প্রতিবেশীদের একটি সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বেঁধে রেখেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চন্দ্রমোহনের মা হচ্ছে মদন মাতবরের পাড়া থেকে দেড়মাইল দূরবর্তী ‘জাগ্রা বিল’ মৌজার ভোলাইয়া গ্রামের মেয়ে এবং তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী ২৩ মাইল দূরবর্তী কাংরাছড়ি মৌজার একটি মেয়ে। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, চন্দ্রমোহনের দুই বোনের বিয়ে হয়েছে তার নিজের গ্রামেই।

মদন মাতবরের পাড়া ছাড়বার পূর্বে আমি চন্দ্রমোহনের চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি পরিদর্শন করলাম। এই চাচাত ভাইয়ের নাম গোপোঙ্গা। এই বাড়ি দেখার পেছনে একটি কারণ ছিল। তা হচ্ছে, মাটির ঘর দেখার পর একটি বাঁশের তৈরি ঘর দেখার ইচ্ছা আমার ছিল। গোপোঙ্গার ঘরটি এই ধরনের একটি সুন্দর ঘর এবং তা বাকি আর সব ঘরের তুলনায় আয়তনেও বেশ বড়। এই ঘর দেখার পেছনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হ'ল পাঠক বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে, বিবাহিত একটি মেয়ে তার স্বামীকে নিয়ে সেখানে বাস করছে—যদিও এই নিয়ম তানচাঙ্গিয়া পরিবারে বিরল (এই গ্রামে বিরল নমুনা একটিই দেখলাম)। আমার কপাল ভালো যে একই গ্রামে পরিবারের নমুনার ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যত্যয় লক্ষ্য করতে পারলাম এবং এই দুই ব্যতিক্রমধর্মী নমুনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণালাভের জন্য আমি এই সুযোগকে কাজে লাগালাম।

এখানে প্রদত্ত নক্‌শা পাঠককে বাড়ির (ঘর) পরিকল্পনা বুঝতে অনেক সাহায্য করবে। নক্‌শাটি অবশ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। জামাতাকে এই পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই কারণে যে, উক্ত পরিবারের পুত্রসন্তান পিতাকে সাহায্য-সহায়তা করার মত পরিণত বয়সে পদার্পণ করে নি—এ ছাড়া আমি মনে করি না যে অন্য কোন মন্তব্যের প্রয়োজন এখানে আছে। যদি আমার পর্যবেক্ষণ ঠিক হয় তবে বলা যায় যে এই একান্নবর্তী পরিবার অস্থায়ীভিত্তিক। আমি এই গ্রামে খাদ্য রাখার জন্য কোনো স্বতন্ত্র গুদামঘর বা গোলাঘর দেখলাম না। যে দুটো বাড়ি আমি পর্যবেক্ষণ করেছি তাতে লক্ষ্য করলাম যে, শয়ন কক্ষের মধ্যে বিরাট বেলুনাকৃতির ঝুড়িতে চাল রাখা হয়েছে—এই কাজের জন্য এই ঝুড়ির ব্যবহার সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলেই রয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুইটি মগ গ্রাম

(মারমা)

উপজাতি—মগ (মারমা)
মৌজা—মানিকছড়ি (২০৮ নং)
গ্রাম—তিনতুরি
৮০টি পরিবার (ঘর)
জনসংখ্যা—৫০০

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সন।

আমরা ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে মং রাজার অতিথি ছিলাম। এখানে পৌঁছানোর পর আমরা একটা মনোরম সন্ধ্যা কাটালাম। মগ গ্রাম পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে সর্দার (প্রধান) আমাদের সবরকম সাহায্য করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সুতরাং পরদিন ভোরে তিনি আমাদের তিনতুরি গ্রামে নিয়ে গেলেন। এই গ্রামটি মোটামুটি প্রসিদ্ধ এবং এটাকে একটা বড় গ্রাম বলাই ঠিক হবে। গ্রামটি একটি সঙ্কীর্ণ নদীর পার বরাবর লম্বালম্বি চলে গেছে। গ্রামের এক প্রান্তে পৌঁছে আমরা যখন জীপ গাড়ি থেকে নামছিলাম তখন একজন লোক সেখানে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল এবং আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। দশগজ দূরে থেকে নতজানু হয়ে ভূমির সঙ্গে মাথা স্পর্শ করে সে সর্দারকে অভিবাদন জানালো। সর্দার জলদগম্ভীর কণ্ঠে তার উত্তর দিলেন। এর পর লোকটি আমাদের দিকে মাথা নোয়াল। সে এই গ্রামের কারবারী—নাম 'চাইলঙ্ ফা দেওয়ান' এবং খুবই সম্মানী কারবারী। আমাদিগকে চারিদিক ঘুরিয়ে দেখাতে বলা হ'লে সে আমাদের তার আবাসস্থলে নিয়ে গেল।

তিনতুরি
কারবারী চাইলঙফা দেওয়ানের পরিবার
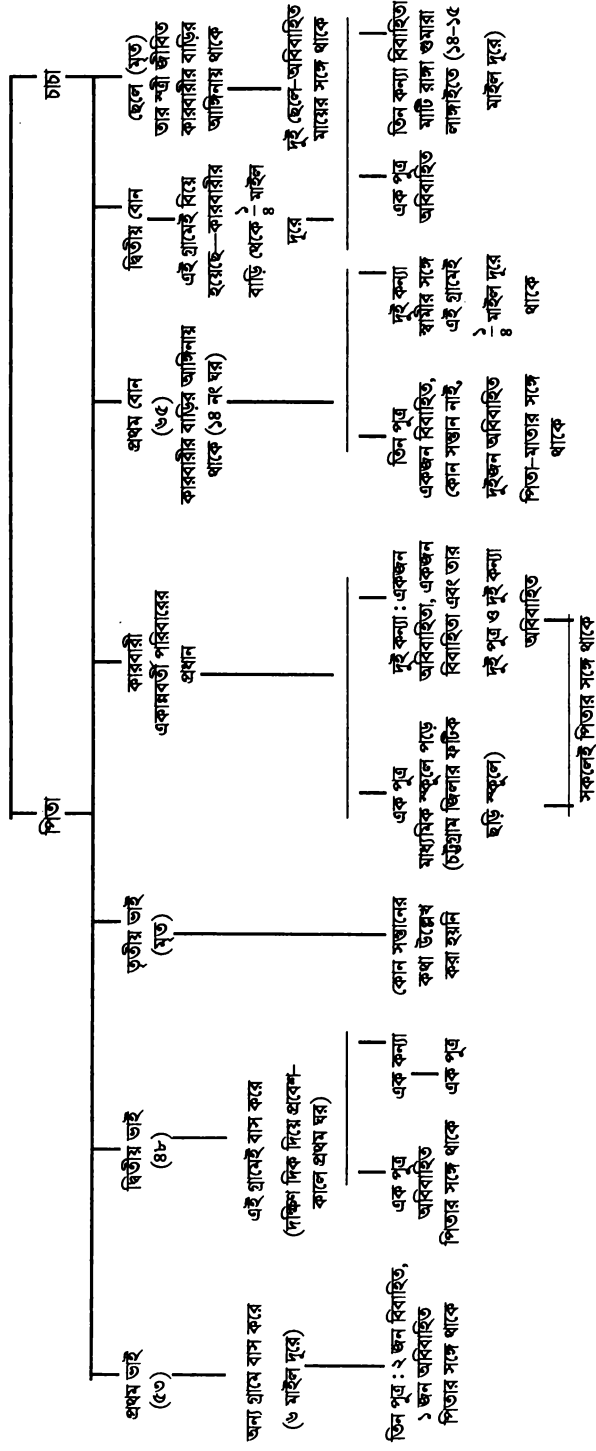
সেটা একটা বিরাট আঙ্গিনা, গাঢ় সবুজ রং-এর পাতলা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা দেখতে বেশ মনোরম এবং সুন্দরভাবে রক্ষিত। আমি বলি না যে এই পরিবার আমাদের অনধিকার প্রবেশকে স্বাগতম জানিয়েছিল। কিন্তু রাজা ও সরকারি কর্মচারী হিসাবে পরিচিত মিঃ প্রিয়দর্শন দেওয়ান-এর উপস্থিতি যিনি এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দোভাষী হিসাবে রয়েছেন—আমাদেরকে গ্রহণের জন্য যথেষ্ট ছিল। 'কারবারী' নিজেই তার সাধ্যমত সবকিছু করল। প্রতিটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখার জন্য সে আমাদের আমন্ত্রণ জানালো। মানব জাতিতত্ত্বের কথা উত্থাপন করলে এ ব্যাপারে সে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করল, যা উপজাতীয় লোকদের মধ্যে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না।

নক্‌শাতে দেখা যাবে আঙ্গিনাটি তিনটি এলাকায় বিভক্ত, যথা—ক, খ এবং গ। 'ক' এলাকা কারবারী ও তার নিজের পরিবার দখল করে আছে। অন্য দুই এলাকায় নিকট-আত্মীয়রা থাকে। যদি কেউ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত তনচাঙ্গিয়া পরিবারের সঙ্গে এদের তুলনা করেন তবে তিনি দেখতে পাবেন যে, 'ক' এলাকা সেই মাটির ঘরের সঙ্গে তুলনীয়, যেখানে পুত্র ও নাতি-নাতনী এক সঙ্গে একটি পরিবার হিসাবে বাস করছে। অনুরূপভাবে 'খ' ও 'গ' এলাকা সেইসব বাড়ির সঙ্গে তুলনীয় যেখানে বোন, চাচাত ভাই-বোন ইত্যাদি একই আঙ্গিনায় বাস করে। মদন-মাতবরের পাড়ার লোকদের মধ্যে যে ভাব দেখলাম প্রকৃতপক্ষে এখানকার লোকদের মধ্যেও সেই ভাবই লক্ষ্য করলাম, যদিও প্রত্যেক ভাই নিজের ঘর তৈরি ক'রে পৃথক পরিবার নিয়ে বাস করে এবং এমনকি বাড়ির সীমানা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে ও প্রত্যেকেরই নিজস্ব জমি থাকে। তবে বড় পরিবারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সকলেই কাছাকাছি ঘর তুলে বসবাস করাকে প্রাধান্য দেয়। এক কথায় বলা যায় যে উভয় গ্রামে একই বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। যদিও উপজাতিরা বিভিন্ন তবুও পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামগুলি জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক নির্দেশ করে। যেখানে জামাইদের নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার এক হয়ে গেছে সেসব ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য আরও প্রকটভাবে দেখা যায়। যেমন, 'ক' এলাকায় কারবারী ১নং ঘর এবং তার বিবাহিতা কন্যা ও জামাতা ২নং ঘর দখল করে আছে। ৩নং ঘর পানি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দুই ঘর তৃতীয় ঘরের সঙ্গে (৩নং ঘর) কতকগুলি শক্ত খুঁটির উপর খাড়া হয়ে আছে এবং একই মাচান দিয়ে সংযুক্ত। এর সব সদস্যই একান্নবর্তী পরিবারের হয়ে কাজ করে। জমি কারবারীর নামে রেজিস্ট্রী করা আছে এবং সকলেই তা ব্যবহার করে। এই তরুণ দম্পতি (জামাই ও মেয়ে) জামাইয়ের নিজের গ্রামে বাস না করে কারবারীর সঙ্গে থাকে, তার কারণ চাইলঙ্ ফা দেওয়ানের একমাত্র পুত্র গ্রামের বাইরে হাইস্কুলে পড়ে এবং পিতাকে সাহায্য করার মত বয়স তার এখনও হয় নি।

তিনতুরি গ্রামের কারবারীর বাড়ির আঙ্গিনা

১. চাইলঙ্ ফা দেওয়ান, তার স্ত্রী, ১ কন্যা ও ৩ জন চাকর।
২. কন্যা, জামাতা ও তাদের ৪ সন্তান (২ কন্যা, ২ পুত্র)
৩. পানি রক্ষণাগার (পানির পাত্র রাখার স্থান)
৪. চাউলের বা ধানের গুদাম।
৫. –ঐ–
৬. –ঐ–
৭. ধান পেষার যন্ত্র (কারবারীর)।
৮. সভাস্থল ; বিচারালায়।
৯. মন্দির।
১০. গুদাম ঘর।
১১. চাচাত ভাইয়ের স্ত্রী।
১২. তার মেয়ে, জামাই ও দুই ছেলে।
১৩. হাঁস-মুরগী।
১৪. বোন, ভগ্নীপতি ও ২ ছেলে।
১৫. রান্নাঘর।
১৬. ধান পেষার যন্ত্র।
১৭. গুদাম ঘর।
১৮. উনান।
১৯. কাপড় শুকানোর দড়ি বা জায়গা।
২০. –ঐ–

তিনতুরি গ্রামের কারবারী পরিবার
(ঘর ১, ২ ও ৩)

১. চাইলঙ্‌ ফা দেওয়ান, তার স্ত্রী, এক মেয়ে ও তিন জন চাকর।

২. মেয়ে, জামাই, তাদের চার ছেলেমেয়ে (দুই ছেলে, দুই মেয়ে)।

৩. পানির পাত্র রাখার ঘর।

ক—কারবারীর বিছানা।
খ—মেয়ের বিছানা।
গ—স্ত্রীর বিছানা।
ঘ—শিশুর দোলনা (ঝুলান)।
ঙ—সিন্দুক।
চ—ঐ।
ছ—ঐ।
জ—অতিথি কক্ষ, এখন তিন চাকর ঘুমায়।
ঝ—বারান্দা।
ঞ—পাত্র ও কলসি।
ট—খাবার ঘর (জামাইয়ের)
ঠ—জামাই ও তার পরিবারের শয়ন-কক্ষ।
ড—সাধারণ মঞ্চ (মাচান)।
ঢ—মই।
ণ—কাপড় শুকানোর দড়ি বা জায়গা।

~ বেড়া।
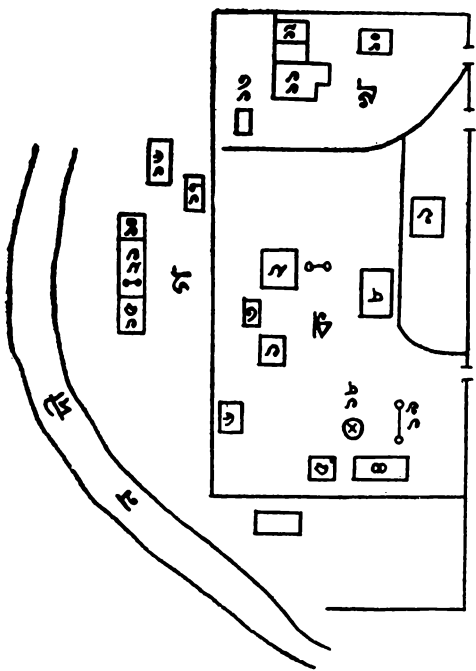
দেখা যায় কারবারীর আওতায় ৮টি ঘর আছে। ১, ২ ও ৩নং ঘরের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। ৪, ৫ ও ৬নং হ'ল গুদাম ঘর—যা উপজাতীয় জীবনযাত্রার মানদণ্ডের বিচারে এই পরিবারের স্বচ্ছলতারই পরিচায়ক। এই পরিবারের ৬৮ একর সমতলভূমি, ২০টি গরু–বাছুর ও ৩০টি মহিষ আছে। ৭ নং ঘরে ধান পেষার যন্ত্র আছে। ৮নং ঘর সাধারণ সভা–স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এখানে কারবারী সমাজ–প্রধান হিসাবে গ্রাম্য সভা–সমিতির পৌরহিত্য করে ও ছোটখাট বিরোধের মীমাংসা করে।

অন্য এলাকা দুটিতে চাইলঙ ফা দেওয়ানের দুই নিকট–আত্মীয়ের পরিবার বাস করে। 'খ' এলাকায় তার চাচাত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এবং 'গ' এলাকায় তার এক বোন বাস করে। বেশ মজার ব্যাপার এই যে এই দুই পরিবারেও কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম, যে গুলিকে 'ব্যতিক্রম' বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ততটা ব্যতিক্রমের ব্যাপার নাও হতে পারে, কেননা এ রকম ব্যাপার অন্যত্রও লক্ষ্য করেছি। কারবারীর চাচাত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে তার মেয়ে–জামাই ও তাদের দুই ছেলে থাকে। এটা আর একটি মাতৃআবাসিক (Matrilocal) পরিবারের উদাহরণ (ব্যতিক্রম)। কারবারীর বোন যদিও বিবাহিত কিন্তু সে ভাইয়ের এত নিকটে বাস করে যে তার পরিবারটিকেও 'মাতৃআবাসিক' বলে মনে করলে ভুল হবে না।

সঙ্গের তালিকাটিতে কারবারীর পিতা থেকে বর্তমান কনিষ্ঠ উত্তর–পুরুষ পর্যন্ত পারিবারিক যোগসূত্র দেখান হয়েছে। এবং এখানে আমরা এমন চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব যা আমরা ইতিপূর্বেই অবহিত হয়েছি।

প্রথমত, ছয় ভাই–বোন, যাদের মধ্যে কারবারীও একজন। চারজন (দুই ভাই, দুই বোন) তিনতুরি গ্রামেই বাস করে।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য (একই গ্রামে বাস এবং এমনকি বিবাহিতা কন্যাদেরও একই গ্রামে বাস) বিদ্যমান।

তৃতীয়ত, পুত্রেরা (এমনকি বিবাহিত পুত্রগণও) পিতার সঙ্গে বাস করে। এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত একান্নবর্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া একজন বিবাহিতা কন্যার পরিবারটিও মাতৃআবাসিক পরিবারের আরেকটি দৃষ্টান্ত।

চতুর্থত, যাদের অন্য গ্রামে বিয়ে হয়েছে তাদের বাসস্থানও তিনতুরি গ্রাম হতে খুব দূরে নয়।

এ সমস্তই এমন একটি পারিবারিক সংগঠনের পরিচয় বহন করে যেখানে কাছাকাছি দলবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আরও বলতে পারি যে, যেসব বহিরাগত এই গ্রামে বিয়ে করে তাদের অধিকাংশই আশেপাশের গ্রামের লোক। যেমন, কারবারীর মা এসেছে দুই মাইল দূরবর্তী মারোকি অং গ্রাম থেকে, তার স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ মাইল দূরবর্তী পশ্চিম পাড়া থেকে এবং তার জামাতা এসেছে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত চন্দ্রঘোনা থেকে। এছাড়া তনচাঙ্গিয়াদের মত মগদের মধ্যেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই তিনটি এলাকার প্রত্যেকটিতে যেসব ঘর রয়েছে তা একই মাচার উপর গঠিত। কিন্তু মদন মাতবরের পাড়াতে এ রকম গঠন–প্রণালী পরিলক্ষিত হবে না।

উপজাতি—মগ
মৌজা—মানিকছড়ি (নং ২০৮)
গ্রাম—মোলঙ্গীপাড়া
৮টি পরিবার (ঘর)
লোকসংখ্যা—৫০ জন

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সন।

তিনতুরি গ্রামে যাওয়ার পরের দিন খুব ভোরে উঠে আমরা 'বন্যপাখি' শিকারে বেরিয়ে গেলাম এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচটি পাখি শিকার করলাম। আমাদের ফিরে আসার আগেই রাজা তাঁর হাতীকে আমাদের কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। এটি ছিল ১৫ বৎসরের একটি মাদী হাতী। এর মাহুত ছিল একজন মগ, সে কোনো আঁকড়া ছাড়াই হাতীর কানের উপর পা রেখে চালাচ্ছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ছোট ডালপালা কেটে আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য তার ডান হাতে ছিল একটি দা। আমাদের দেখে সে হাতীকে আমাদের দিকে শুঁড় তুলে অভিবাদন জানাতে বাধ্য করল।

প্রাতরাশের পর আমাদের আমন্ত্রণকারীর কাছ হ'তে আমরা বিদায় নিলাম, কারণ তিনি শিকারের পর বিশ্রাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমরা হাতীর পিঠে চড়ে রওনা হলাম।

আমার মতে, রাজা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই চিন্তা করেছিলেন যে একটি বড় গ্রাম দেখার পর পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি ছোট গ্রামও দেখা উচিত, যেখানে 'ঝুম চাষ'ই একমাত্র চাষের ব্যবস্থা। গ্রামটি পাহাড়ের উপরিভাগে অবস্থিত, কেননা রওয়ানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতী আমাদের নিয়ে যখন রাজার প্রাসাদের পশ্চাদভাগে খাড়াভাবে উঠ্‌তে লাগল, তখন আমরা তার পিঠ শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হয়েছিলাম।

মোলঙ্গীপাড়া ঘনবসতিপূর্ণ। ছেলেমেয়েদের নিকট হাতীটি একটি কৌতুকের বস্তু হয়ে উঠল, যেমন আমরাও তাদের কাছে কৌতুহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ালাম। আমরা তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেলাম। মিঃ জনসন কালবিলম্ব না ক'রে যথারীতি গ্রাম পর্যবেক্ষণের কাজে লেগে গেলেন। আমি ঘরগুলির চারিদিক দেখতে লাগলাম। লোকসংখ্যার মোটামুটি একটা হিসাব নিলাম এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের সঙ্গে একত্রে বসে তাদের সামাজিক গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে আলাপ করতে লাগলাম।

মোলঙ্গীপাড়া
গ্রামটির সামাজিক কাঠামো

তিনতুরি

(১৬) কারবারীর বাড়ী (ঘর নং ১, ২, ৩)

(১৭) সভাকক্ষ
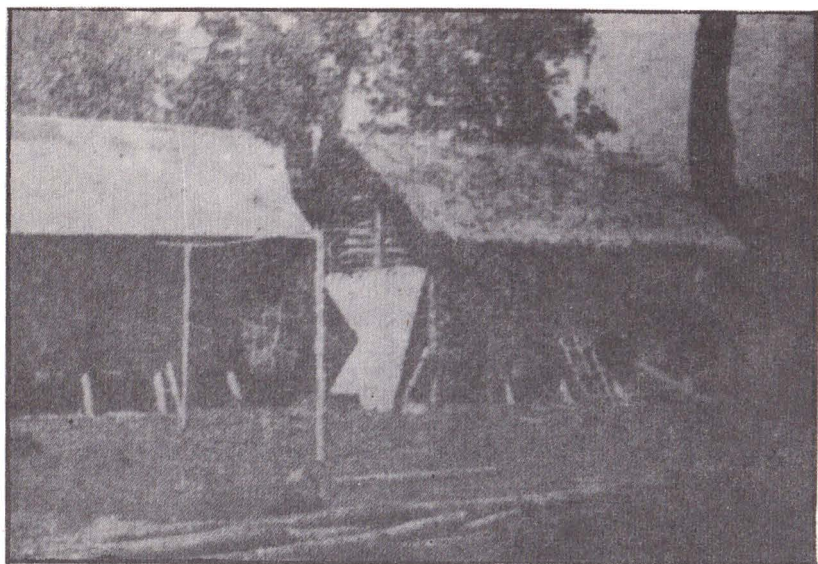
(১৮) গুদাম ঘর (ঘর নং ৪ ও ৫)
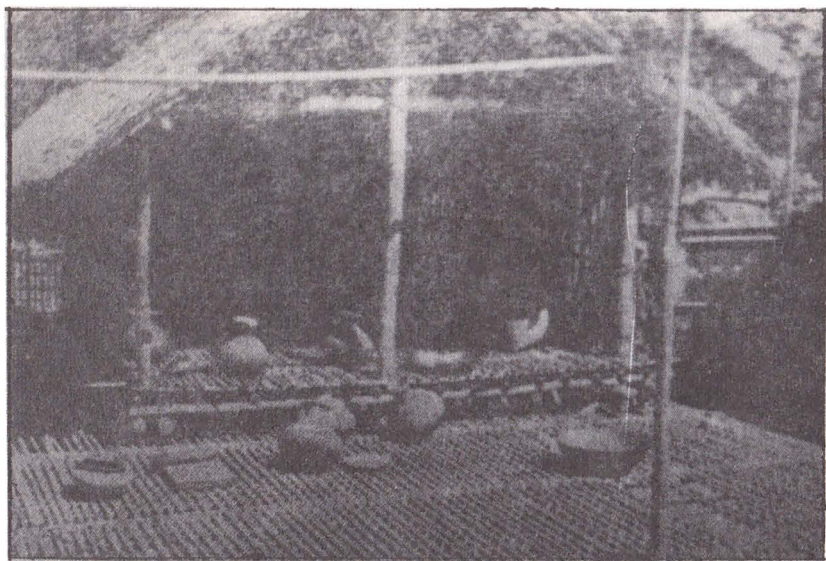
(১৯) জল সংরক্ষণের জায়গা

মোলঙ্গী-পাড়া
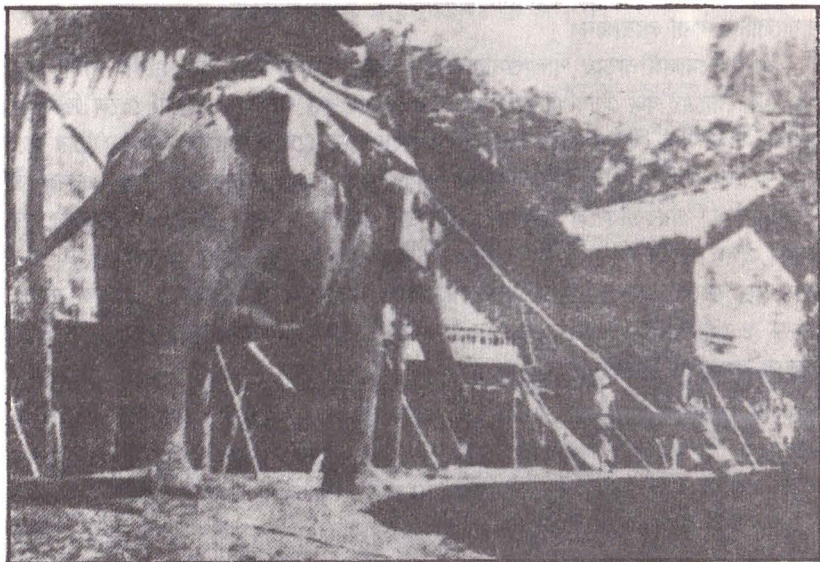
(২০) "গ্রামটি পাহাড়ের চূড়ায়"

মোলঙ্গীপাড়ায় মোট ৮টি বাড়ি আছে। ৪টি 'পালাগুসা' ও ৪টি 'কোণ্ডিয়া' গোত্রের—মগ উপজাতি যে ক'টি গোত্রে বিভক্ত এই দু'টি তার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম চারটি বাড়িতে যথাক্রমে ৩ ভাইয়ের পরিবার ও ১ বোনের পরিবার বসবাস করে। বোন এখানে বাস করলেও তা 'মাতৃআবাসিক পরিবারের' (Matrilocal) দৃষ্টান্ত বহন করে না। তাই এই গ্রামে বাস করার একমাত্র কারণই হ'ল এই যে সে এখানকারই তার এক দূর-আত্মীয়কে বিয়ে করেছে। অপর ৪টি বাড়িতে যথাক্রমে ৩ ভাই ও তাদের একজনের শ্বশুর বাস করে। এদের সামগ্রিক কাঠামোর আদি সম্পর্কে জানতে হলে এদের ভূবাসন-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমে মোলঙ্গীপাড়ায় পালাগুসারা (তিন ভাই, তাদের বোন ও বোনের স্বামী) এবং কোণ্ডিয়া গোত্রের বৃদ্ধ লোক (শ্বশুর) বাস করত। এই বৃদ্ধ লোকের কোনো ছেলে ছিল না। সুতরাং যখন তার মেয়ের বিয়ে হ'ল তখন নবদম্পতি (মেয়ে জামাই) এখানে তার সঙ্গে বাস করতে লাগল। এটা 'মাতৃআবাসিক পরিবারের' একটি নমুনা বটে, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার নয়। পরবর্তীকালে জামাতার দুই ভাই এই গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। প্রথম দলের (পালাগুসা) ভাইদের স্ত্রীরা ও কোণ্ডিয়া দলের জামাতার দুই ভাই অন্য গ্রাম থেকে এসেছে। কিন্তু তালিকায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এইসব নবাগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক মোলঙ্গীপাড়ার খুব নিকটবর্তী জায়গা থেকে এসেছে এবং এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চাকমাদের বাল্যজীবনের বর্ণনা

উপজাতি—চাকমা
মৌজা—রাউগাপানি (১০২ নং)
গ্রাম—কাটাছড়ি
১২৬টি পরিবার (ঘর)
জনসংখ্যা–৭০০

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সন।

তিনি আরাম কেদারা ছেড়ে উঠলেন। তারপর বারান্দা থেকে নিচে নেমে এসে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য চমৎকার ইংরেজিতে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। এই প্রথম আমরা একটি চাকমা গ্রামে এলাম। এই গৃহস্বামীর (আমন্ত্রণকারী) ব্যবহার এবং তাঁর বসবাসের পরিবেশ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা দেখে এসেছি তার থেকে আশ্চর্য রকম পৃথক। সত্যি কি চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতি থেকে এতই ভিন্ন?

আমার বুঝতে বেশি বিলম্ব হ'ল না যে আমরা আবার একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছি এবং যাকে আমার দেখছি তিনি তাঁর স্বজাতিদের থেকে আলাদা। তিনি তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে ধনী, শিক্ষিত ও কিছুটা ইংরেজি ভাবাপন্ন। তাঁর দুই পুত্র রাঙ্গামাটি হাইস্কুলে পড়ে এবং তাদের একজন কলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যেভাবে চা পরিবেশন করা হ'ল তাতে তাঁর স্বতন্ত্র জীবন-মানের পরিচয় পাওয়া গেল। বুঝতে পারলাম বাড়ির মেয়েরা যদিও চাকমা পোশাক পরে কিন্তু ছেলেরা সাহেবী পোশাক পরিধান করে। আমাদের আমন্ত্রণকারীর নাম বিজয়কুমার দেওয়ান। তিনি বললেন, "আমার ৮ একর প্রথম শ্রেণীর সমতল জমি ও ৩ একর দ্বিতীয় শ্রেণীর সমতল জমি আছে। যে গ্রামে শতকরা ৬৫ জন লোক ঝুম চাষ করে সেখানে এই পরিমাণ সমতল জমি থাকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার এই অবস্থার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমিই এই সম্প্রদায়ের নেতা। অবশ্য এটা বেসরকারী ব্যবস্থা। এখানে একজন কারবারী আছে, কিন্তু আমি সমাজের একজন স্বীকৃত প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমার বাড়িতেই কেবল পায়খানা আছে।"

'কাটাছড়ি' চাকমাদের সবচেয়ে বড় গ্রাম। এত ভাল ইংরেজি বলতে পারে এমন একজন মানুষকে পেয়ে তাদের পারিবারিক সংগঠন সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজনই অনুভব করলাম না। যে বিষয় নিয়ে এতদিন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলাম তার থেকে অন্য কোন দূর বিষয় নিয়ে কেনই বা আলোচনা করব না? ইতিপূর্বে পারিবারিক সম্পর্কের যে নিছক কাঠামোগত দিকের পরিচয় লাভ করেছি এতে করে হয়তো তাতে কিছুটা রং চাপানো যাবে।

আমি বিজয়কুমার দেওয়ানকে চাকমা বালক-বালিকাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি রাজী হলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে ডেকে নিকটে থাকতে বললেন, কারণ প্রয়োজন হ'লে তার কাছ থেকেও তথ্য নিবেন। তারপর তিনি নিম্নরূপ বর্ণনা দিলেন :

"শিশুদের মাতৃদুগ্ধ দেওয়া হয়। মায়ের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্য কোনো দুধ দেওয়া হয় না। দেড় বছর পর্যন্ত এই নিয়মই চলে। এই সময়ের মধ্যে মা যদি অন্য কোনো শিশুর জন্ম না দেয় তবে এইভাবে দুধ খাওয়ানো দুই বছর পর্যন্তও চলতে পারে। যতদিন পর্যন্ত শিশু মাতৃস্তন্য পান করে ততদিন পর্যন্ত তাকে কোন শক্ত খাবার দেওয়া হয় না। মায়ের দুধ ছাড়ানোর পর তাকে ভাত ও তরিতরকারি খাওয়াতে অভ্যস্ত করানো হয়। ১৫ মাস বা দুই বছরের শিশু দুধ খাওয়ার সময় কখনও কখনও স্তনে কামড় দেয়। এটা কষ্টদায়ক হলেও এ থেকে অব্যাহতি লাভের কোনো উপায় নেই।

শিশুদের স্বাধীনভাবে মল ত্যাগ করতে দেওয়া হয়। তারা কোনো রকম প্যান্ট পরে না। প্রায় ২ বৎসর বয়সে শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়, কেননা সেই সময় সে এটা-ওটা এবং ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানলাভ করে। এর পূর্বে কোন চেষ্টা করাই বৃথা। যখন আমরা শিশুর অভ্যাসাদি আয়ত্তে আনতে চাই তখন তার প্রতি দৃষ্টি রাখি। যখন তার মলত্যাগের উদ্রেক হয় তখন তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাই। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী গ্রামে কোনো পায়খানা নেই। সুতরাং বয়স্কদের মত শিশুরাও যেখানে খুশি পায়খানা-প্রস্রাব করে, তবে তারা আঙ্গিনা নোংরা না করলেই হয়।

৩/৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা বাপ-মার সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমায়। এর পরে তারা পৃথক কামরায় ঘুমায়। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গেই ঘুমাতে দেওয়া হয়। তারপর তারা সাধারণ কামরার পৃথক পৃথক কোণে শোয়। ছেলেমেয়েদের পৃথক রাখার জন্য কোনো আলাদা বেড়া দেওয়া হয় না।

ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। ছেলেরা 'পুরু' খেলা খেলে-এতে এক মাঠের দুই দিকে দুই দল থাকে এবং একদল অপর দলের দিকে দৌড়ায়। তারা 'হা-ডু-ডু'ও খেলে। এটা হ'ল ধরা ও ছোঁয়ার খেলা। ছেলেমেয়েরা 'গিলা' খেলাও খেলে, এটা এক রকম মার্বেল

খেলা যেখানে মার্বেলের বদলে, ছোট কাঠের 'চাক্‌তি' ব্যবহার করা হয়। মেয়েরা পুতুল খেলে না কিংবা খেলে না 'মা-সন্তান' খেলা।

৭/৮ বছরের সময় থেকেই ছেলেমেয়েরা বড়দের কাজে সাহায্য করতে শুরু করে। মেয়েরা ঘর-সংসারের কাজ ও তাঁত বোনা শুরু করে ; ছেলেরা পশু মাঠে নেওয়া ও ক্ষেত থেকে পশুপক্ষী তাড়ানো শেখে। ১০ বছরের সময়ই সাধারণত ছেলেরা বড়দের সঙ্গে মাঠের কাজে যায়। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের কাজ দেওয়া হয়, যেমন, মাঠে আইল তৈরিকরণ ইত্যাদি। এইভাবেই তারা বিবাহযোগ্য বয়স না হওয়া পর্যন্ত কাজ শেখে।

ছেলেরা ১৬ থেকে ২৫ বৎসর বয়সের ভিতরেই বিয়ে করে এবং মেয়েদের জন্য ১৬ বছরই ধরা হয়। যাই হোক, ১৩/১৪ বছরই সবচেয়ে কম বিবাহযোগ্য বয়স বলে মনে করা হয় এবং এরকম বয়সের বিয়ের দৃষ্টান্ত খুব কম।

প্রথমে, ছেলের বাবা তার ছেলের জন্য একটি কনে পছন্দ করে। কনে যদি তার পছন্দমাফিক উপযুক্ত বিবেচিত হয় তবে সে কনের 'বাবা'র কাছে তার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তবে, সে সরাসরি এটা করে না। যার উপর তার আস্থা আছে এই রকম একজন লোককে সে ঘটক হিসাবে পাঠায়। ঘটক এ সম্বন্ধে যোগাযোগ স্থাপন ও আলোচনা করার পর খবর দেয় যে কনের বাবা-মার এ 'বিয়েতে' মত আছে কি-না। যদি তারা মত দেয় তবে ছেলের বাবা মেয়ের বাবা-মায়ের জন্য পিঠা, বিস্কুট, সুপারি, শাকসব্জী, আখ ও মদ নিয়ে যায়। ৩/৪ জন লোক ছেলের বাবার সঙ্গে এ সমস্ত উপহার বয়ে নিয়ে যায়। যদি ছেলের বাবাকে সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং বিয়ের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ছেলেকে কনের বাড়িতে ৪/৫ বার যেতে হয়। বাবার মত ছেলেও ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য উপহার নিয়ে যায়।

যখন বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসে তখন ছেলের বাবা আরও বড় রকমের উপহার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। মেয়ের বাবার অনুরোধে ছেলের বাবা ২০.০০/৩০.০০ টাকা, ১টা শূকর, ১০/১২ আড়ি চাউল (এক আড়ি এক পোয়ার মত) নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট দিনে ছেলে ও মেয়ের বাবা তাদের আত্মীয়স্বজন এমনকি তাদের দুই গ্রামের সমস্ত লোকদের ভূরিভোজের জন্য খাবার যোগাড় করে। ভোজের জন্য শূকর, গরু ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। দুই গ্রামের লোকদের পৃথকভাবে খাবার পরিবেশন করা হয়। ছেলের বাবা তার গ্রামের এবং মেয়ের বাবা তার নিজের গ্রামের লোকদের পরিবেশন করায়। বরপক্ষরা গহনা-পত্র, কাপড়-চোপড় ও বিয়ের যাবতীয় জিনিস-পত্র যা কনের বিয়ের সময় প্রয়োজন হয়, সেসব নিয়ে কনের গ্রামে যায়। তারা প্রথমে এইসব কনের বাবা-মাকে দেখায়, তারপর তা অন্য আত্মীয়স্বজনদের দেখান হয়। বরপক্ষের কোনো এক ব্যক্তি কনের এক আত্মীয়ের সাহায্যে কনেকে এইসব উপহার দিয়ে সাজিয়ে দেয়। তারপর তারা

কনেকে নিয়ে বরের গ্রামে যায়, কারণ বিবাহ্‌-উৎসব সবসময়ই বরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।[১]

বর ও কনে এখন বরের বাড়িতে। রক্ষিত খাদ্যসামগ্রীর সামনে তারা পাশাপাশি উপবিষ্ট। গ্রামের মন্দিরের বৌদ্ধ ভিক্ষু দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তাদের কিছু হিতোপদেশ প্রদান করেন। এরপর একটি শূকর এই উপলক্ষে বলি দেওয়া হয়। কোন পক্ষেরই আত্মীয় নয় এমন একজন লোক একটা সাদা কাপড় দিয়ে বর ও কনেকে এক সঙ্গে বেঁধে দেয়। কয়েক মিনিট এইভাবে রাখার পর তাদেরকে বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং তখন থেকেই তারা স্বামী-স্ত্রী রূপে পরিগণিত হয়।

নতুন দম্পতি বস্তুতপক্ষে আরও ২/৩ রাত একসঙ্গে শয়ন করতে পারবে না। বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার পর তারা কিছু ফল-মূল সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়িতে এসে সেখানে ২/৩ দিন অবস্থান করে। তারপর তারা বাড়ি ফিরে আসে। এইভাবে বাল্য ও কৈশোর কাল কাটিয়ে তারা পূর্ণ মানব জীবনে প্রবেশ করে।"

এই বিবরণ প্রদানের জন্য বিজয়কুমার দেওয়ানকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই।"

সত্যিই, বিজয়কুমার দেওয়ানের মত একজন উপজাতীয় লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

---

১. "বর কি পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কনেকে ক্রয় করে তা এখানে নির্ধারিত হয়। কারণ চাকমা যুবক অর্থ দিয়ে স্ত্রীকে ক্রয় করে থাকে। যদিও অন্যান্য উপজাতির মধ্যে এই প্রথার প্রচলন নেই। সাধারণত এই মূল্য ১০০.০০ টাকা থেকে ১৫০.০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিয়ের দিনে দুই পক্ষ থেকেই প্রচুর খাদ্য-সামগ্রীর জোগাড় করা হয়।"—Lewin পৃ. ৭০-৭১ দ্রষ্টব্য।

"সাধারণ বিয়ে ক্রয়-পদ্ধতিতেই হয় এবং কনের মূল্য টাকা পয়সা, গহনা, কাপড়-চোপড়, শূকর, চাউল এবং ভাতের তৈরি মদের দ্বারা স্থির করা হয়।"--Levi-Strauss, *Kinship Systems,* প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একটি ম্রো পরিবার

উপজাতি—ম্রো
মৌজা—রেনিখাইয়াং (৩১৫ নং)
গ্রাম—দেওয়াই মাতবরের পাড়া
২৫টি পরিবার (ঘর)
জনসংখ্যা গণনা করা হয় নাই।

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সন।

আজ সকালে আমরা অধীর হয়ে উঠেছি। বান্দরবন থেকে আগত রাস্তার দক্ষিণ পাশে একটি ম্রো[১] গ্রাম দেখার জন্য খুঁজে চলেছি। আমাদের বলা হয়েছিল যে আমরা গ্রামটির খুব কাছাকাছিই আছি, কিন্তু গ্রামটি দেখা যাচ্ছিল না। রাস্তাটি অসমতল। এখানে সেখানে বাঁশ ও বেতের গাছ। খালি জীপ গাড়ি পার করার আগে প্রতিটি কাঠের ছোট পুলই মজবুত করে নিতে হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এস.ডি.ও অফিসের একজন 'মগ' অফিসার ও দুই জন 'ম্রো' উপজাতির লোক। একজন হলেন যে মৌজাতে আমরা যাচ্ছি তার মাতবর, অন্যজন সেই মৌজার একজন কারবারী। মাতবর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত বান্দরবন এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। কিন্তু এখনও গ্রামটির কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে সরকারি অফিসার ক্রমেই রাগান্বিত হয়ে উঠছেন। মাতবর কি আমাদের বোকা বানাচ্ছে? একটু আগেই মাতবর জানিয়েছিল আরও পাঁচ মাইল আছে। আমরা দশ মাইল অতিক্রম করেছি, কিন্তু এখনও সে বলছে আমরা সেখানে পৌঁছায় নি। তার কি ইচ্ছা যে তাদের লোকজনকে না দেখেই আমরা ফিরে যাই? মাতবর আগের মতই উত্তর দেয় যে আমরা প্রায় এসেই গেছি, বোধহয় আর মাইল দুয়েক আছে। কিন্তু 'ম্রো' এই দুই মাইল বলতে কি বুঝায়? সে কোনক্রমেই আমাদের ফিরে যেতে দিতে চায় না। কারণ সেখানকার লোকজনের কাছে সে আগেই সগর্বে বলেছে যে সে শীঘ্রই দুইজন সাহেবকে সঙ্গে করে আসছে। কিন্তু এদিকে আমাদের পেট্রোল ফুরিয়ে আসছিল।

---

১. আমাদের ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে এই গ্রামের অধিবাসীরা 'মুরং' কিন্তু আমাদের পরিচালক জানালেন যে এরা নিজেদের 'ম্রো' বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে।
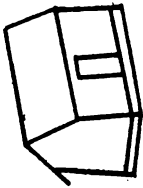
দেওয়াই মাতবরের পাড়া
চানয়ুম (Chanyum) কারবারীর পরিবার
চানয়ুম (৬৫)
স্ত্রী – (৬০)
দক্ষিণ নগর থেকে এসেছে ৯২০ মাইল)
(বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী)
৪ কামরা
প্রথম পুত্র (৪০)
স্ত্রী–মনরায় কারবারীর পাড়ার (৩ মাইল) চানয়ুমের সঙ্গে থাকে
১ পুত্র ৯১০)
২ কামরা
দ্বিতীয় পুত্র (৩৫)
স্ত্রী–হাউচাম কারবারীর পাড়া থেকে (৪ মাইল) সলক মৌজা চানয়ুমের সঙ্গে থাকে
১ পুত্র (৮)
১ কন্যা (৪)
৮ কামরা
তৃতীয় পুত্র (৩০)
স্ত্রী–বয়টিয়া পাড়া থেকে (৬ মাইল) উত্তর নগর মৌজা চানয়ুমের সঙ্গে থাকে
কোন ছেলেমেয়ে নাই (গতবৎসর বিয়ে করেছে)
৯ কামরা
অবিবাহিত পুত্রগণ ৩ বা ৪ জন চানয়ুমের সঙ্গে থাকে
১ কামরা
প্রথম মেয়ে (৪২)
পনটোলা মৌজায় বিয়ে হয়েছে (২০ মাইল)
ছেলেমেয়ের সংখ্যা জানা যায় নাই
দ্বিতীয় কন্যা (৩৭)
পনটোলা মৌজায় বিয়ে হয়েছে (২০ মাইল)
ছেলেমেয়ের সংখ্যা জানা যায় নাই
অবিবাহিত কন্যা (৫ জন) চানয়ুমের সঙ্গে থাকে
১ কামরা

তিনতুরি গ্রামের কারবারীর গোলাঘর

৪, ৫ ও ৬ ধানের গোলাঘর।
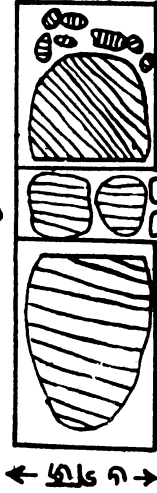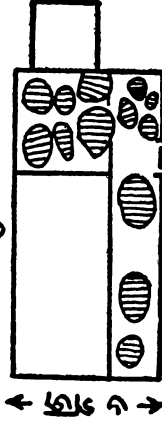
দেওয়াই মাতবরের পাড়া

চানয়ুম কারবারীর পরিবারের বাড়ি

১. প্রধান কামরা, অতিথি ও অন্যান্য কাজের জন্য।
২. বড় ছেলের কামরা (পূর্বে পিতার ঘর ছিল), স্ত্রী, একটি ছেলে।
৩. কারবারী ও কারবারীর স্ত্রীর কামরা।
৪. বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর কামরা।
৫. রান্না করার জায়গা।
৬. তাক।
৭. মাচান।
৮. মেজ ছেলে, স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ের কামরা।
৯. সেজ ছেলের ও তার স্ত্রীর কামরা।
১০. ধান শুকানোর জায়গা।
১১. সিঁড়ি।
১২. সিঁড়ি।
    a. সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি।
    b. ছেলেদের ঘুমানোর জায়গা।
    c. মেয়েদের ঘুমানোর জায়গা।
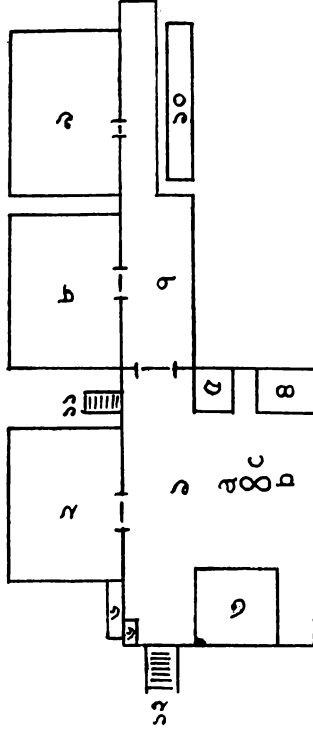
আমরা 'ম্রো' উপজাতিদের না দেখেই ফিরে যাব ভাবছি, এমন সময় মাতবর আমাদের থামতে এবং রাস্তার ডান পাশের জঙ্গলের মধ্যে ৩ ফুট চওড়া একটা ফাঁকা জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি।'

আমরা দাঁড়িয়ে ঐ ফাঁকা জায়গাটির মধ্যে উঁকি মেরে দেখলাম আমাদের ভাগ্যে কি আছে—দেখলাম একটা হাঁটা পথ অতি গভীর উপত্যকার দিকে নেমে গেছে। আরো খারাপ লাগলো এই পথে ফিরে আসার কষ্টের কথা চিন্তা করে। রাস্তাটি প্রায় খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। আমরা এই পথেই অগ্রসর হলাম। কয়েক মিনিট পরে আমরা গ্রামটি দেখতে পেলাম—বিন্দু বিন্দু একত্রিত অনেকগুলি ঘরের ছাদ, সেগুলির উপর থেকে যা মনে করেছিলাম তার থেকে তিনগুণ দূরে অবস্থিত। এটা ঝুমারদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি গ্রাম।

গ্রামে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম যে এদের ঘরগুলি অন্যান্য উপজাতির ঘর থেকে অনেক আলাদা। কিন্তু গঠন-পদ্ধতি একই রকমের—বাঁশের বেড়া, ছন ঘাসের ছাদ ইত্যাদি। কিন্তু আকারে এই ঘরগুলি তনচাঙ্গিয়া বা মগদের ঘর অপেক্ষা অনেক বড়। এ ছাড়া, কতকগুলি ঘর একই সঙ্গে একটা সাধারণ (একটি মাত্র) মাচা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে, যেমন এই একই পদ্ধতি আমরা তিনতুরি গ্রামেও লক্ষ্য করেছি।

রাস্তাগুলি ফাঁকা, গ্রামটি মরুভূমির মত নির্জন। একটা প্রশস্ত খোলা জায়গা যেটা জনসাধারণের সমাবেশ বা কোনো উৎসবের স্থানের মত দেখা যায়, সেখানে কতকগুলি খাম মাথায় লম্বা কাপড়ের টুকরা নিয়ে খাড়া হয়ে আছে—এক রকমের ধর্মীয় সংস্কার বলা চলে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মতে ম্রোরা বাহ্যত বৌদ্ধ এবং তাদের অধিকাংশই 'সর্বপ্রাণবাদী'। প্রকৃতপক্ষে, তাদের নিজস্ব উপজাতীয় ধর্ম আছে।

মাতবরের ডাকে বাড়ির পুরুষ ও মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের চারপাশে দাঁড়ালো। আমরা তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম এবং শীঘ্রই আমাদের ভাব হয়ে গেল। মাতবরের কাছে তাদের ঘর দেখার ও পারিবারিক গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সে আমাকে কারবারী বাড়িতে নিয়ে গেল।

এই মৌজার মাতবরের নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম 'দেওয়াই মাতবরের পাড়া' হয়েছে। দেওয়াই মাতবর ছাড়া এখানে একজন কারবারীও আছে। কারণ দেওয়াই মাতবর মৌজার, গ্রামের নয়। কারবারীর নাম 'চানয়ুম'। সে একটি বিরাট পরিবারের কর্তা। আমি বসে এই পরিবারের নক্শা তৈরি করলাম।

চাকমা, তনচাঙ্গিয়া বা মগদের মধ্যে একান্নবর্তী পরিবার যেমন একটা ব্যতিক্রম, 'ম্রো'দের মধ্যে আবার এটাই একটা নিয়ম। সেইজন্য লক্ষ্য করা যায় যে কারবারীর পরিবারে রয়েছে—পরিবারের পিতা ও তার বড় ছেলের জন্য একটি শয়ন-কক্ষসহ একটি প্রধান ঘর এবং তার অন্যান্য বিবাহিত ছেলের জন্য তিনটি পৃথক ঘর। একটি সাধারণ মাচার চারপাশে নির্মিত এইসব ঘর মিলেই কারবারীর পরিবার। প্রধান ঘরটিতে দু'টি শয়ন-কক্ষ (নক্শায় ৩নং ও ৪নং রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে)। ৩নং কক্ষটি কারবারী ও

তার স্ত্রীর জন্য এবং ৪নং কক্ষটি কারবারীর বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর জন্য। প্রধান ঘরটি অবশ্য একান্নবর্তী পরিবারের সাধারণ-কক্ষ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রধান ঘরটিতে একটি বড় চুল্লি আছে (নকশায় ৫নং)। যেহেতু আমাকে অন্যান্য ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ল না (কারণ ম্রোদের মধ্যে কোনো অপরিচিত এবং অন্য উপজাতির লোকদের প্রতি এটাই প্রচলিত নিয়ম) সেহেতু আমার পক্ষে তাদের অন্যান্য ঘরে পৃথক পৃথক চুল্লি আছে কিনা বলা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যায় যে, এটা (৫নং) এত বড় যে সমগ্র পরিবারের, বিশেষ করে, উৎসবের দিনে রান্না-বান্নার কাজে এটাই যথেষ্ট। b ও c চিহ্নিত স্থানে যথাক্রমে অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরা ঘুমায় (শিশুরা বাবা-মার সঙ্গে ঘুমায়)। a চিহ্নিত স্থানে বাদ্যযন্ত্রসমূহ রাখা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'ল পরিবারের প্রত্যেকেই তাকগুলিকে (৬নং) পানির পাত্র কিংবা লাউ-কুমড়া রাখার কাজে ব্যবহার ক'রে থাকে (আমি দেখলাম বিবাহিত ছেলেদের স্ত্রীরা পুকুর থেকে পানির পাত্রগুলি ভরে এনে সেখানে রাখল)। এছাড়া প্রধান ঘরটি অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২নং কক্ষে বড় ছেলে তার পরিবার নিয়ে থাকে। তারা ৩নং কক্ষে ছিল—নিয়মানুসারে ২নং কক্ষ পরিবারের প্রধানের জন্য। কিন্তু ম্রোদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু কারবারী এখন বৃদ্ধ হয়েছে সেহেতু তার কক্ষটি বড় ছেলেকে দেওয়া হয়েছে, কারণ বড় ছেলের উপরই পিতার সমস্ত কর্তব্য ক্রমশ বর্তাবে। ৮ ও ৯নং ঘরে অন্য দুই বিবাহিত ছেলে থাকে। এটা ধরে নেওয়া যায় যে যখন অবিবাহিত ছেলেরা সাবালক হয় এবং বিয়ে করে তখন মাচাটি আরও বড় করে নতুন ঘর সংযুক্ত করা হয়।

পারিবারিক তালিকায় দেখা যায় যদি মেয়েরা বিয়ের পর দেওয়াই মাতবরের পাড়া থেকে মাইল বিশেক দূরে বাস করে তবে বিবাহিত ছেলেদের স্ত্রীরা সাধারণত নিকটবর্তী গ্রামের (৩/৪ মাইল দূরের) হয়ে থাকে। তনচাঙ্গিয়া ও মগদের মত ম্রোরাও এক সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়ে বসবাস করে।

'দেওয়াই মাতবরের পাড়া' ছেড়ে আসার পূর্বে মাতবর আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। এখানে একটা বড় অতিথি-কক্ষ রয়েছে এবং সেখানে বাঙালিদের তৈরি চেয়ার-টেবিল ও মশারী সংযুক্ত দু'টি বিছানা শোভা পাচ্ছিল। এগুলি মালিকের পদমর্যাদা নির্দেশ করে। আমরা সিদ্ধ ডিম ও ভাতের মদ খেলাম। আমাদের নতুন বন্ধুরা সংখ্যায় প্রায় ৩০ জন মেঝেতে বসেছিল। আমরা তাদের সিগারেট দিলাম এবং ফটো তুললাম।

অভ্যর্থনার পালা শেষ বলে তরুণ ছেলেমেয়েরা আমাদের সম্মানার্থে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করল। তারা জীপ গাড়িতে কয়েক মিনিটের জন্য বসে রাস্তা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিতে চাইল এবং আরও সিগারেট চাইতেও ভুলল না।

দেওয়াই মাতবরের পাড়া
(ম্রো)
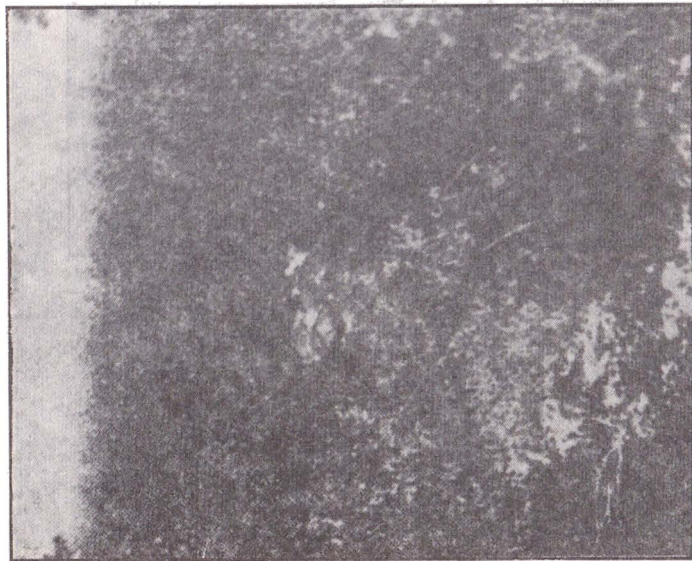
(২১) কয়েকমিনিট পরেই আমরা গ্রামটি দেখতে পেলাম ....
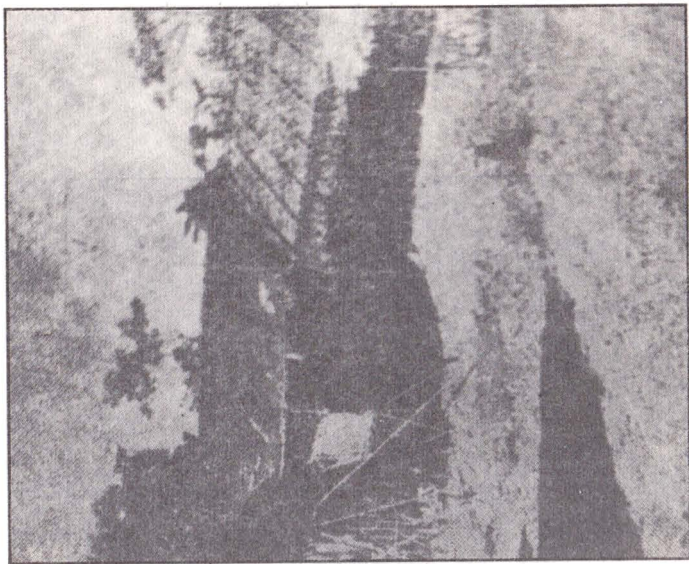
(২২) এই বাড়ীগুলি তনচাঙ্গিয়া বা মগ গ্রামের বাড়ীগুলি থেকে আয়তনে বড়
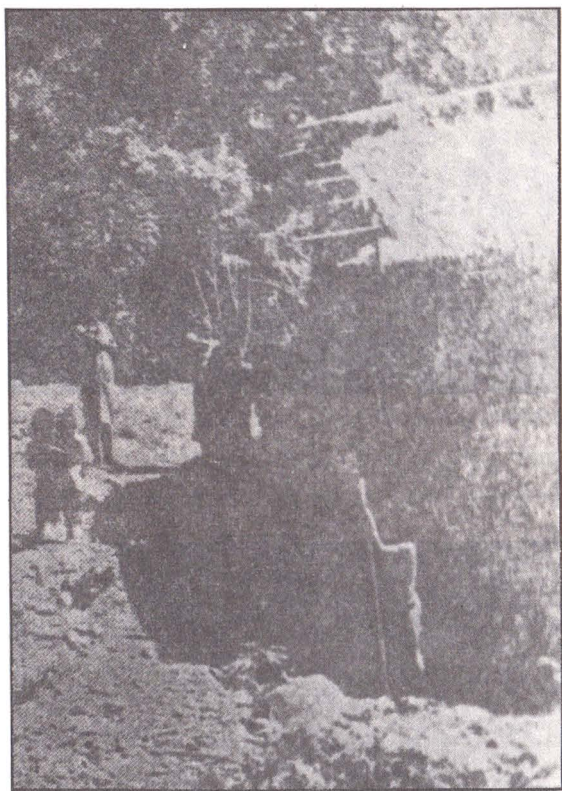
(২৩)

দেওয়াই মাতবরের পাড়া
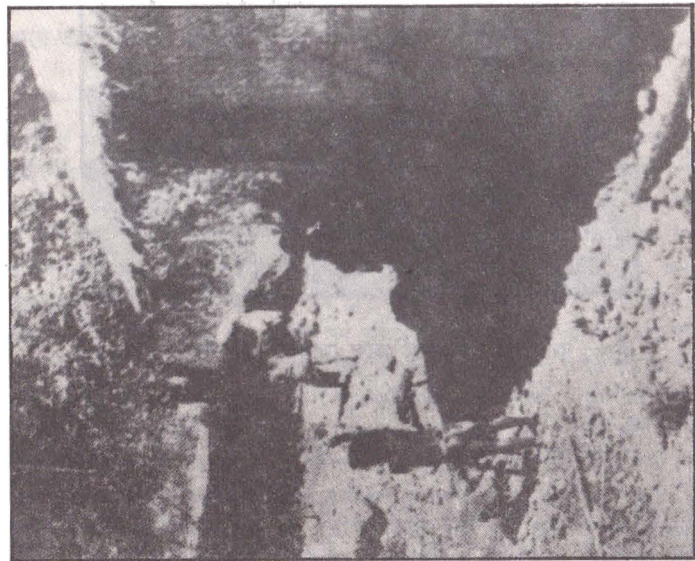
(২৪)
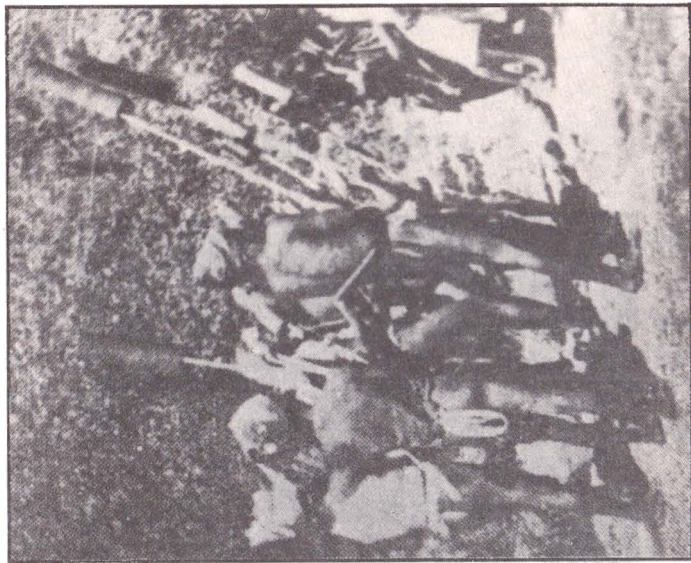
(২৫) আমাদের সম্মানার্থে তরুণ ছেলে মেয়েরা নৃত্য পরিদর্শন করছে

(২৬) আমাদের সম্মানার্থে ছেলে মেয়েরা নৃত্য পরিদর্শন করছে

নবম পরিচ্ছেদ

উপজাতিদের ভবিষ্যৎ

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পাবর্ত্য–অঞ্চলের উপজাতীয় সমাজের হাল বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু উপজাতিদের ভবিষ্যৎ কি সেটা কিছুটা জানা দরকার।

পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজ প্রভাবের সময় থেকেই উপজাতিরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। তার পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তারা প্রচলিত স্থবির সমাজ–ব্যবস্থায় বাস করছিল। এর পর ধীরে ধীরে আজ তারা আধুনিক জগতে প্রবেশ করবার দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রধান পরিবর্তনগুলি এখনও হয় নি, তবে আশা করা যায় কয়েক দশকের মধ্যেই তাদের অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে পারে।

সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকার পার্বত্য অঞ্চলকে রাজস্ব সংগ্রহের উৎস হিসেবে মনে করত। শীঘ্রই তারা রাজস্ব সংগ্রহের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করল। রাজস্ব আদায়ের অনির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে কিছুটা নির্দিষ্ট হার প্রবর্তন করল। এটা কৃষিকার্যকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হ'ল না, অধিকন্তু ব্যবসা–বাণিজ্যের সুবিধা হল। কারণ রাজস্ব সংগ্রহ করায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজ তাদের পণ্যদ্রব্য আমদানি করল। বহু শতাব্দী পর্যন্ত যা চিন্তার বহির্ভূত ছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইংরেজ তা ধীরে, সাবধানে ও নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি এবং বিস্তৃতি সুদৃঢ় করল। [১]

---

১. "অন্যভাবে ইংরেজ সরকার সুদের লগ্নি ব্যবস্থা এবং সুদের দায়ে দাসত্ব অবলম্বন করে সুদ থেকে রেহাই পাওয়ার প্রথাকে নির্মূল করে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুস্থ করে তুলল। এইসব পাহাড়ে ও সমভূমিতে 'সনথালিয়ার' মত শঠ বাঙালি মহাজনেরা আসল উদ্দেশ্য থেকে আইনকে বিকৃত ক'রে এমন এক যন্ত্রে পরিণত করত যাতে সমস্ত জনসাধারণ দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হত। কোনো এক দৈব দুর্বিপাকে যেমন, ফসল নষ্ট হলে, ফসল কেনার জন্য, ছেলের বিয়ের জন্য বা অন্য কোনো কারণে কোন পাহাড়ি কোন মহাজনের কাছ হতে কিছু টাকা ঋণ নিত। সে (পাহাড়ি) লেখাপড়া জানত না এই সুযোগে দলিলে এক অসম্ভব সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকার কথা লেখা থাকত যার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সময় যতই যেতে থাকে টাকার পরিমাণও ততই বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধ হলে মহাজন বলে — 'হে বাছা, তুমি এখন যাও। ঋণের দলিল নষ্ট করে ফেললাম এবং তোমার ঋণ শেষ হয়ে গেল' — এই বলে মহাজন তার সম্মুখে দলিল ছাড়া অন্য কাগজ ছিঁড়ে ফেলত। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরে যেত, আর মহাজন তার শঠতায় কৃতকার্য হয়ে মনে মনে আনন্দ বোধ করত। কিছুদিন পর সে আসল চুক্তিনামা দেখিয়ে দেওয়ানি আদালতে আসল, ঋণ, সুদ ও মামলার খরচ দাবি করে মোকদ্দমা দায়ের করত। মামলায় হাজির হওয়ার জন্য বাঙালি পিওনের দ্বারা পাহাড়িয়া লোকটির সমন পাঠানো হয়। পূর্বেই

সমতলভূমির গুরুত্ব বাড়ছে। যদিও এই অঞ্চলের চাষযোগ্য সমতলভূমি ঝুমভূমি অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর তবুও সরকার এই সমতলভূমি থেকেই অপেক্ষাকৃত বেশি রাজস্ব পেয়ে থাকেন।

এই সকল উন্নতি দেখে কেউ অনুমান করতে পারে যে পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতি আধুনিক কৃষি পদ্ধতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই অবস্থা বোধহয় নাও হতে পারে কারণ,

প্রথমত , নিরক্ষরতা উন্নত কৃষি পদ্ধতি দ্রুত গ্রহণ করতে বাধার সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান ব্যবহারোপযোগী সমতলভূমির সংখ্যারও একটা সীমা থাকবে এবং সেই সঙ্গে লাঙ্গল চাষের বিস্তৃতিরও।

তৃতীয়ত, দ্রুত জমির উর্বরতা কমে আসবে।

উপরিউক্ত কারণগুলি আপাতদৃষ্টিতে যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কৃষির পরিমাণিক উন্নতি নির্দেশ করে, এটা এক অর্থে প্রতারণামূলক, কেননা অতীতে এই পরিমাণিক উন্নতি হতো কেননা তখন জমিকে অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছিল।

'ঝুমিং' পদ্ধতি অনুযায়ী দুই 'দাহনে'র (পোড়ানোর) মধ্যবর্তী সময়ে ভূমিকে অনেক দিন পর্যন্ত শান্ত অবস্থায় থাকতে দেওয়া হয়, যাতে করে জঙ্গলগুলি আরও বড় হতে পারে এবং পোড়ানোর পর প্রচুর ছাইভস্ম হয়, যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অতীতে ৬/৭ বছর অন্তর ভূমি ঝুম করা হতো আর এখন ২ বছর অন্তর পোড়ানো হয়। শীঘ্রই লক্ষ্য করা যাবে যে পাহাড়গুলি লোকজনকে খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে।[২] পূর্বপুরুষদের অপচয়ী ঝুম পদ্ধতিতে চাষের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ভাল চাষ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমেই কৃষির উন্নতি হবে। এবং এটা নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত ঝুম পদ্ধতি উঠে যাবে। কিন্তু উক্ত প্রতিপূরক ব্যবস্থা দুটো অসুবিধার সম্মুখীন হবে, যেমন–নিরক্ষরতা ও সমতলভূমির সীমাবদ্ধতা। যদিও এখানে জলবায়ুর কথা বলা হয় নি, তবুও এখানকার বর্ষাকাল একে আরও ঘোরাল করে তোলে।[৩] অতএব এটা মনে হয় যে বর্তমান অবস্থা, আর্থিক ও সামাজিক গঠন–পদ্ধতিতে

---

২. "পাহাড়িদের গ্রামগুলি নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় বা বিয়ের মাধ্যমে আত্মীয়দের দ্বারা গঠিত। নিকটে চাষের জমি অসঙ্কুলান হলে প্রায়ই গ্রামের স্থান পরিবর্তন করা হয়। একবার ঝুম জমি চাষের পর ৮/১০ বছর পর পুনরায় চাষের উপযোগী হয়, কারণ এর কমে জঙ্গল হয় না এবং এই জঙ্গল পোড়ান ছাই জমির সারের কাজ করে — আর এই সার ছাড়া ঝুমভূমি খুব কম ফসল দেয়।" — Lewin, ১৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

৩. মানসিক দিক থেকেও এর বাধা আছে। Lewin তাঁর সময়ে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেন : "অপরপক্ষে চাষীরা সমতল ভূমিতে চাষ করা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজ বলে মনে করত। সে এক জোড়া মহিষের লেজে নাড়া দিয়ে তার ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে খর দুপুরেও নিরবচ্ছিন্নভাবে

'কৃষি' পাহাড়িয়াদের খুব বেশি উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবে না, যার ফলে কৃষির উন্নতি উপজাতিদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোনো নিশ্চিত পরিবর্তন আনবে না। এর মানে এই নয় যে কৃষির প্রসার হবে না। প্রকৃতপক্ষে কৃষির প্রসার অবশ্যই হবে, কারণ এই অঞ্চল চট্টগ্রাম শহরের একটি উত্তম 'পশ্চাদভূমিতে' পরিণত হবে। কিন্তু সেই অবস্থায় পূর্ণ রূপ নেওয়ার আগেই হয়তো এমন একটা ভিন্নমুখী পরিবর্তনের আঘাত এর উপর আসবে যার ফলে এই পাহাড়ি অঞ্চলের কৃষি পরিবর্তন এর উপর নির্ভরশীল হবে যেমন–শিল্পোন্নয়ন।

এ কথা সত্য যে শান্ত পাহাড়গুলি যা আবহমানকাল হতে জঙ্গলের রাজত্ব ও উপজাতিদের আবাসভূমি ছিল তাতে গত ৫ বছরে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোন্নয়ন হয়েছে—যদিও আজ পর্যন্ত এর চাপ কম কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উপজাতীয় জীবনধারা পরিবর্তনের ক্ষমতা এর আছে।

১৯৫২ সাল পর্যন্তও ঝুম ও সমতলভূমির চাষ ছাড়া এবং সমতলভূমির লোকদের দ্বারা বহন করে নেওয়া পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ উপার্জনের উপায় ছিল না। আজ সেই পাহাড়গুলিতে চারটি শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এই সবই কর্ণফুলী নদীর পাড় বরাবর অর্থাৎ যোগাযোগের একমাত্র প্রধান পথের পাশে। অদূরভবিষ্যতে হয়ত আরও শিল্প প্রতিষ্ঠান হবে, যার ফলে উপজাতিদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হবে। এই সবের মধ্যে প্রথমটি হলো 'কাঠের কারখানা' (Ply-wood factory), দ্বিতীয়টি 'কাগজের মিল', তৃতীয়টি 'বাঁধ' এবং চতুর্থটি 'একটি উঁচু রাস্তা' — যা প্রথম তিনটি প্রতিষ্ঠানকে চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করেছে। এই চারটি প্রতিষ্ঠান সরকারের নিজের বা সরকারের অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থ দ্বারা পরিচালিত (এর ভিতর তিনটি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল)।

এ সবের মধ্যে কেবল Ply-wood (কাঠের) কারখানাই জনসাধারণের অর্থে গঠিত। এর কর্মচারী মাত্র এক শত। সুতরাং আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য একে বাদ দেওয়া

হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্যে ডুবিয়ে কাজ করে যায়। মাঠের ভিতর কোনো গাছ বা ছাউনী নাই যার ছায়ায় বসে সে মধ্যাহ্নের খাঁ খাঁ রৌদ্র থেকে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিতে পারে। শুধু তার চতুষ্পার্শ্বে থাকে অবাধ কর্দমাক্ত ধানী জমি। তাদের স্ত্রীরা ঈর্ষণীয়ভাবে জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কামরার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর এর মধ্যে চাষী যদি তার মধ্যাহ্ন খাবারের জোগাড় করতে পারে তবে সে তা তার ঐ কর্দমাক্ত লাঙ্গলের পাশে বসেই গ্রহণ করে। সমতলভূমি চাষে পাহাড়ি একদিনে ২.০০ টাকা উপার্জন করে — এইটাই তার অপেক্ষাকৃত তৃপ্তিদায়ক পরিশ্রম। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই যে পাহাড়িরা তাদের জীবনযাত্রার প্রতি খুব আবেগপ্রবণ এবং তাদের স্বাভাবিক বন্য জীবনযাত্রার পদ্ধতির পরিবর্তে একঘেয়ে সমতলভূমির অধিবাসীদের জীবন-প্রণালী অবলম্বন করার প্রস্তাবকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে।" — Lewin, ১১ পৃ.দ্রষ্টব্য।

চলে। চন্দ্রঘোনাতে অবস্থিত কর্ণফুলী কাগজের মিল শ্রমিক আকৃষ্ট করেছে। পরিবারসহ তাদের বসতি দশ হাজারের কম হবে না। কাপ্তাইয়ে অবস্থিত কর্ণফুলী বাঁধ পরিকল্পনা — যা একটি বাঁধও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র নিয়ে গঠিত, ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে খনন কার্যের জন্য এগার হাজার শ্রমিক এতে নিয়োগ করা হয়। পরিবার ছাড়াই এতে এক সময়ে সর্বসমেত বিশ হাজার (২০,০০০) লোক জমা হয়েছে। এইসব শ্রমিকদের মধ্যে খুব কম লোকই পরিবার সঙ্গে রাখতে সক্ষম। উঁচু রাস্তাটির জন্য ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সাত হাজার (৭,০০০) লোক নিয়োগ করা হয়। এ জায়গায় আবার পুনরাবৃত্তি করছি যে, ৬ বৎসর পূর্বে এ সবের কিছুই ছিল না। এই সমস্ত কর্মোদ্যম এবং অবশ্যই পরে যে সব হবে, সে সবই হয়ত কৃষির পরিবর্তনের চেয়ে পাহাড়িদের উপরই দ্রুত প্রভাব বিস্তার করবে। এর ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন, পাহাড়গুলির শিল্পোন্নয়নই প্রথমে একে নিয়ন্ত্রিত করবে। এই শিল্পোন্নয়ন কতদূর অগ্রসর হবে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, কিন্তু আজ যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তা এই পাহাড়িদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিবর্তনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে। [৪]

---

৪. পাহাড়িদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বার্নটের (Bernot's) অভিমত নিম্নে বর্ণিত হ'ল :
"বাঙালিদের চাল-চলন, রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালীর অনুপ্রবেশই উপজাতীয় সমাজ ও কৃষ্টির প্রতি এক বিরাট হুমকিস্বরূপ। যদিও একথা সত্যি যে, তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান তবুও স্বীকার করতেই হয় যে বাঙালি সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতি দ্বারা রূপান্তরিত ইউরোপ ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক উপাদান তাদের কাছে নতুন ও আকর্ষণীয়। এছাড়াও রয়েছে জনসংখ্যার চাপ। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িরাই সংখ্যাগুরু কিন্তু সমগ্র প্রদেশে যেখানে বাঙালিরা ৪ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি সেখানে তারা আড়াই লক্ষেরও কম। যদি অন্যান্য জেলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকজন চলে আসতে থাকে (বস্তুত যা প্রতীয়মান হচ্ছে) তবে পাহাড়িরা তাদের নিজস্ব সত্তা হারিয়ে এদের মধ্যে মিশে যাবে অথবা বিতাড়িত হবে।

অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চশিক্ষিত পাহাড়িদের কাছে বাঙালি সংস্কৃতির হুমকি ইতিমধ্যেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনজন সার্কেল প্রধানের (সর্দার) ছেলেদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্থানীয় আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে এই তিনজন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল। একজন পুরোপুরি বাঙালি-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে এবং বাঙালিদের রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়জন উপজাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত এবং একনিষ্ঠভাবে সেগুলি পালন করছে। সে দেশ ছেড়ে রেঙ্গুনে বসবাস করার কথা চিন্তা করছে। তৃতীয়জন বাঙালি ও উপজাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করছে।

সমন্বয় সাধনের দ্বারা উদ্ভুব নতুন প্রথা স্থায়ী হবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে, তবে জানা দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে যারা কিছু কিছু বাঙালি প্রথা গ্রহণ করেও মূলত তাদের নিজেদের প্রথাকেই ধরে রেখেছে তারাই নতুন উদ্ভূত নেত্রী স্থানীয়দের গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে।" — Lucien Bernot, loc. cit. p.60.

"কর্ণফুলী নদীতে একটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র বসান হচ্ছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাট একটা অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে, ব্যাপকভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে

সাময়িকভাবে পাহাড়িরা এইসব নতুন 'শিল্প প্রতিষ্ঠানে' চাকরি পাচ্ছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কর্ণফুলী কাগজের মিলে ৩,২৯০ জন শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১৪ জন পাহাড়ি। পার্বত্য অঞ্চলে যে শ্রমশক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেই শ্রমশক্তির স্থান পূরণ করতে মানসিক বা কলাকৌশলের দিক থেকে উপজাতীয়রা এখনও অনুপযুক্ত। এই জেলার বাইরে থেকেই এইসব প্রকল্পের জন্য কর্মী আমদানি করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের বাকি অংশ থেকে অনিপুণ, সমগ্র পাকিস্তান থেকেও এমন কি বিদেশ থেকেও নিপুণ কর্মী আনা হয়। এইসব অবস্থার পরিবর্তন হবে কিনা সেটা এত আগেই সঠিকভাবে জানা বা অনুমান করা যায় না। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য স্থানের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রাথমিক শিল্পায়নকালে পূর্বশর্ত হিসাবে বা ফলস্বরূপ চতুর্দিকের জনসাধারণকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো এবং তাদেরকে শহরে কেন্দ্রীভূত করে সস্তাদরের শ্রমিকে রূপান্তরিত করা হত। বাজারের সাধারণ নিয়ম অনুসারে যখন আর্থিক অবস্থা এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট না হয় তখন রাষ্ট্র নিজেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে (যেমন-ফ্রান্স ও জার্মানীতে)। একথা সুবিদিত যে ইংল্যাণ্ডে অবরোধ আইন (Enclosure Act) দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং এই উপমহাদেশে দেশবিভাগ লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সৃষ্টি করেছে—যারা, করাচী শহরের উপকণ্ঠে বাস করে পশ্চিম পাকিস্তানের নতুন উদ্ভূত শিল্পের শ্রমশক্তি হিসাবে কাজ করছে। এটা অসম্ভব নয় যে কর্ণফুলী বাঁধ পরিকল্পনার কাজ শেষ হলেও ছোট আকারে কিছু কাজ চলতে থাকবে।

এখন যেমন অবস্থা তাতে কাপ্তাই বাঁধ ১৯৬০ সনে উদ্বোধন করা হবে। সেই সময়ে নদী বন্ধের ফলে এর পানির উচ্চতা বাড়তে থাকবে এবং বৃহদাকার কৃত্রিম হ্রদের উপর একটা প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হবে এবং এর ফলে এই জেলার সবচেয়ে ভাল সমতলভূমিতে বন্যা আসবে ও অনেক গ্রাম ডুবে যাবে। প্রায় ৯০ হাজার উপজাতি, যার অধিকাংশই চাকমা, তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত হবে। এই সমস্ত বিপর্যস্ত অবস্থার ছিন্নমূল মানুষরাই হয়তো শিল্পের শ্রমশক্তি হবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে উপজাতিদের দ্বারা কি এটা সম্ভব? একাধিক কারণে এটা সন্দেহজনক। ১৯৬০ সন ও তার পরবর্তী বৎসরই বলবে যে এই আদিম ভূমির শিল্পোন্নয়ন এর অধিবাসীদের জন্য শ্রমশিল্প সংক্রান্ত কোনো ভবিষ্যতের দ্বার খুলবে কিনা। যখন এখানে কলকারখানা গড়ে উঠবে তখন এটাও অনেক

এবং এইভাবেই স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসবে। প্রদেশের অন্যান্য স্থান থেকে যারা বসবাসের জন্য এখানে আসছে, সম্ভবত তাদের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত পাহাড়িরা তাদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।" — Lucien Bernot, p.54.

পরীক্ষার মতো একটি পরীক্ষা হবে যা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপজাতিদের ভবিষ্যতের উপর আলোকপাত করবে।

উপজাতীয় লোকদের রাতারাতি শিল্প-শ্রমিকে পরিণত করা যাবে কি-না তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেউ হয়ত স্থানচ্যুত চাকমাদের অন্য কোনো পাহাড়ে স্থানান্তরিত করে কৃষিকার্যে নিয়োজিত করার কথা বলবে। কিন্তু উপজাতিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বাদ দিলেও মগেরা নিজেদের স্থানে চাকমাদের নিতে রাজী হবে না, তাছাড়া এটা খুব দুষ্কর কাজও বটে। আর্থিক এবং যান্ত্রিক দিক থেকে বিবেচনা করলে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পের বিস্তৃতিতে যেসব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের কষ্টের কথা খুব কম করেই পরিমাপ করা হয় যেমন এক্ষেত্রে উপজাতিদের হয়েছে।

এশিয়াতে যে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী শক্তির দ্বারা আর্থিক পরিবর্তনের ধারা থেকে এটা ভিন্ন প্রকৃতির। পশ্চিমী দেশগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানায় যেসব শিল্প গড়ে উঠেছিল এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে তা গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র-মালিকানায় ভূমি বন্টনের ও রাজস্ব আদায়ের প্রাচীন পন্থা থেকেই যাত্রা শুরু করা হয়েছে, যা পশ্চিমী শক্তি ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করেছিল। পাশ্চাত্য ধারণায় 'পুঁজিবাদী শ্রেণী' অতটা কায়েমী স্বার্থবাদী নয়, সেই পুঁজিবাদী শ্রেণী এশিয়াতে কোনো দিনও ছিল না এবং আজও তা নাই। ব্যক্তিগত পুঁজি বলতে যা বোঝা যায় এখানে তা কদাচিৎ দেখা যায়। নব্য স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্প পরিবর্তন এশিয়াতে ঘটছে তা সেই চিরাচরিত 'রাষ্ট্র মালিকানা' কাঠামোর মূল যন্ত্র দিয়ে কিছু পরিবর্তিত রূপে আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে করা হয়েছে। প্রথমে রাষ্ট্র-মালিকানায় পুঁজি গড়ে উঠল। যেমন আমরা দেখতে পাই, এশিয়াতে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রবাদ হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রবাদ। যখন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যক্তিগত অর্থে গড়ে উঠা শিল্পের তত্ত্বাবধানের জন্য রাষ্ট্র অগ্রসর হচ্ছে তখন এশিয়াতে পুঁজিপতিদের উদ্যমে ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য এক শক্তি কাজ করছে। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের চেয়েও এই শক্তির প্রধানত যান্ত্রিক শিল্পের দিকেই বেশি ঝোঁক। পার্বত্য চট্টগ্রামের শক্তিশালী বাঁধ ও বড় বড় কারখানার স্বপ্নই এই পরিকল্পনাকে প্রেরণা দিচ্ছে।

যদি সরকার স্থানচ্যুত উপজাতিদের উদ্ভূত শিল্পে অথবা কৃষিকার্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তাদের অনাহারে জীবন-যাপন অথবা উদ্বাস্তুদের মতো পথের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প
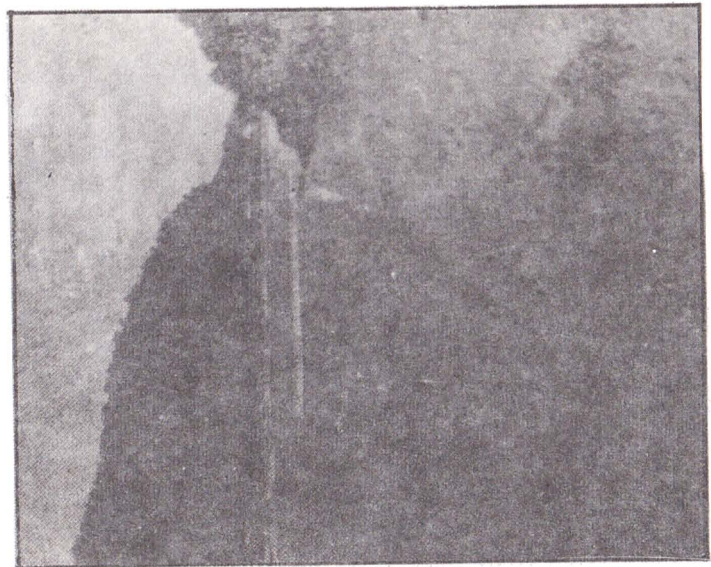
(২৮) নদী বাঁধ প্রভৃতি হইতে বাড়তি জল নির্গমনের পথ

(২৯) কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁশের ভেলা
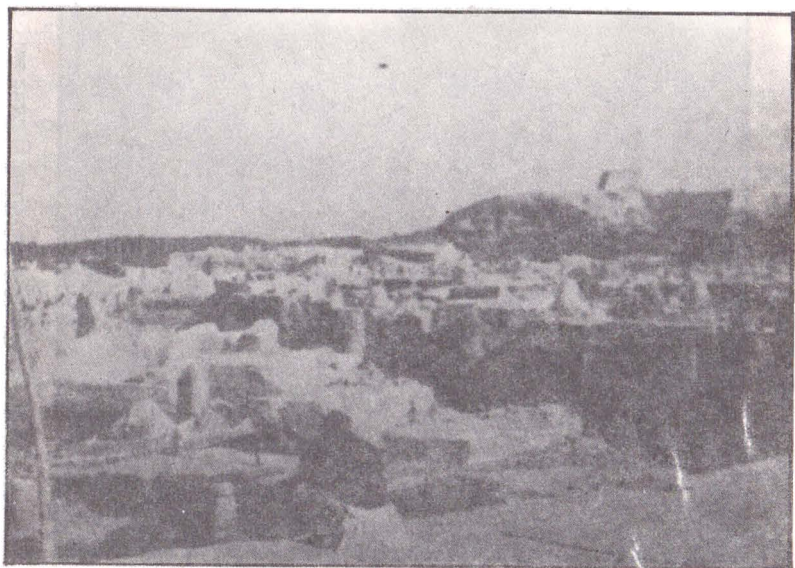
(২৯)
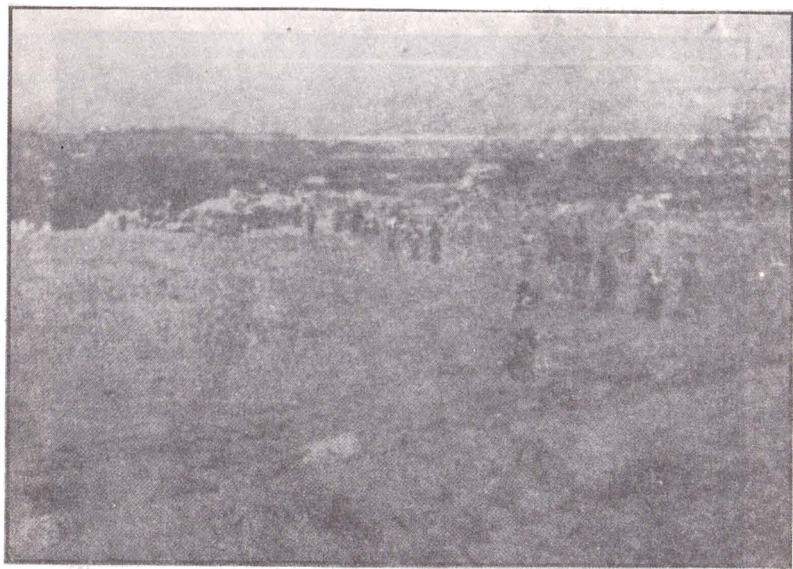
(৩০)
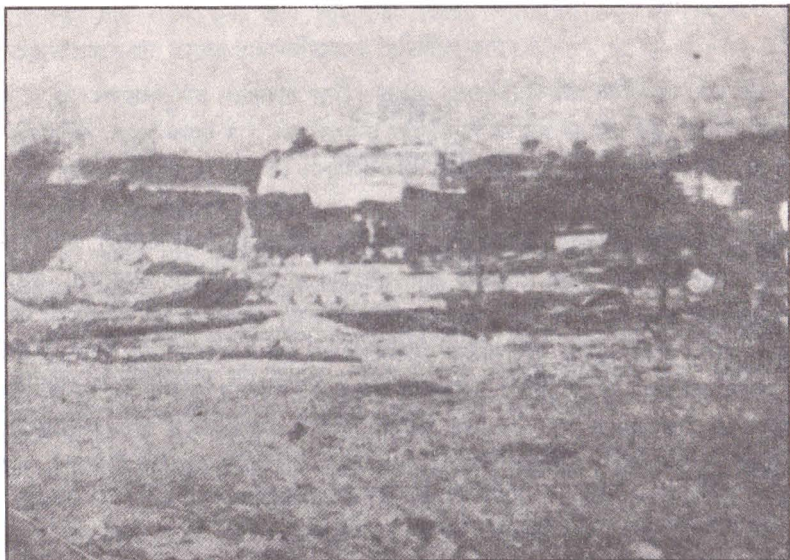
(৩১) শ্রমিকদের বাস স্থান
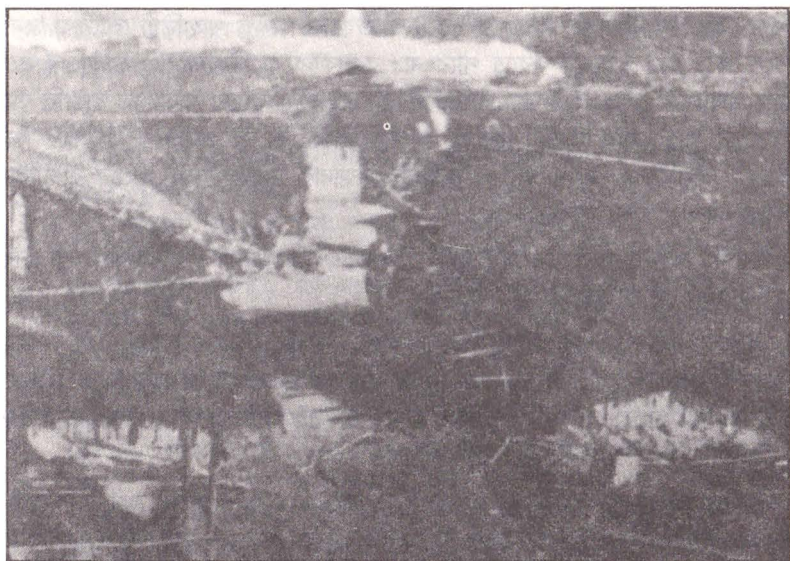
(৩২) শ্রমিকদের বাস স্থান

পরিশিষ্ট–১
বিবিধ তথ্য

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি এমনসব তথ্যে পূর্ণ যা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং সেই কারণে এগুলিকে মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। যাহোক, আমার মনে হয়, এগুলি 'জাতিবিদ্যার' ছাত্রদের কাছে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হবে। এগুলিকে দুই শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে– একটি হ'লে 'অর্থনৈতিক জীবনধারা ও রাজস্ব সংগ্রহ' এবং অপরটি হ'ল 'সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি'। এইভাবে পাঠক এই বইয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের আলোচনার সঙ্গে এগুলির সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হবেন। কর্মক্ষেত্রে (field) এগুলি যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এখানেও ঠিক সেইভাবেই উপস্থাপন করা হল।

ক. অর্থনৈতিক জীবনধারা ও রাজস্ব সংগ্রহ

১. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উপজাতীয় লোকদের 'কাঠ' নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। কাঠ তারা বিনামূল্যে পেয়ে থাকে এবং কারও যদি কাঠের প্রয়োজন হয় তবে সেখান থেকে সে প্রয়োজন মতো তা কেটে নিতে পারে। কিন্তু পাহাড়িয়া লোকেরা 'বনজ সম্পদ' দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে না। কন্ট্রাকটর বা ঠিকাদারগণ সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমেই কেবল কাঠ ক্রয় করতে পারে। এইসব ঠিকাদার সাধারণত বাঙালি তবে কয়েকজন পাহাড়িয়াও আছে। সুতরাং পাহাড়িদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে কাঠ সংগ্রহের অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও ভাড়াটে ঠিকাদার নিযুক্ত করে কাঠের বাণিজ্যিক ব্যবহার সরকারই করে থাকেন।

ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। তারা সরকারকে প্রাপ্য টাকা দেয়। উপজাতিরা এর থেকে কিছু পায় না।

২. যে ব্যক্তি ঝুম চাষ করতে চায়, সে প্রথমে একটি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে। তারপর মাতবরের সম্মতিক্রমে তার নির্বাচিত জায়গাটি তালিকাভুক্ত করে নেয়। এইভাবে সে ঐ ভূমির (ঝুমের) পূর্ণ অধিকার লাভ করে। যদি দুই ব্যক্তি একই জায়গা বাছাই করে তবে মাতবরই ঠিক করে দেয় কে সেটার অগ্রাধিকার পাবে।

কোনো ব্যক্তি তার নিজ মৌজা ত্যাগ না করেও অন্য মৌজাতে ঝুম চাষ করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে জমি দখল করার নিয়মও তার নিজ মৌজার মতই। তবে ঝুমচাষীকে তার নিজ মৌজার মাতবরকে ৬.০০ টাকা এবং যে মৌজায় ঝুম করবে সেই মৌজার মাতবরকে ৩.০০ টাকা দিতে হবে।

৩. যদি সম্ভব হয়, তবে পাহাড়িরা বছরের পর বছর একই ঝুম-ভূমিতে কাজ করতে চায়। এটা তাদের গ্রাম্য-জীবনকে স্থিতিশীল করে। [১]

৪. সমতলভূমির অধিকার স্থায়ী। অর্থাৎ এতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকে, যা ঝুমভূমির ক্ষেত্রে থাকে না। যখন কোনো পাহাড়িয়ার জমির দরকার হয়, তখন প্রথমে সে সেই স্থান দখল করে। তারপর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি পেশ করে। এইভাবেই সে স্থায়ী দখলী-স্বত্ব লাভ করে।

৫. ফলের গাছ যারা দাবি করে তারাই তা ব্যবহারের অধিকার পায় এবং এগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতোই রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

৬. সাধারণত একখণ্ড ঝুমভূমি একবার পোড়ানো হলে তা ২ থেকে ৩ বৎসর ব্যবহার না করে ফেলে রাখার পর আবার পোড়ানো হয়। এই ফেলে রাখার ফলে জঙ্গল গজায় এবং এই জঙ্গল পোড়ানো ছাই-ই মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।

৭. যদি কোনো ব্যক্তি তার বাসস্থানে সুবিধামত কোনো ঝুমভূমি না পায়, তাহলে যেখানে সে ভূমি পাবে এরকম পছন্দমত কোনো মৌজা বা গ্রামে তার জিনিসপত্র সঙ্গে করে সে চলে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সাবেক মৌজার প্রতি তার আনুগত্যেরও ছেদ ঘটে। যাহোক পরে সে ব্যক্তি তার সাবেক গ্রামে ফিরে আসতে পারে এবং এ-ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

৮. অনেক সময় মাতবরের নিজের ঝুম বা সমতলভূমি থাকে এবং অনেক সময় কোন জমিই থাকে না। এসব ক্ষেত্রে খাজনা আদায় থেকে যে আয় হয় তার থেকে সে জীবিকা নির্বাহ করে।

---

১. তাই বলে, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, এটাই তাদের নিয়ম। গ্রামবাসীরা ভাল 'ঝুমভূমি'র সন্ধানে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়।

"বাসস্থান পরিবর্তনের কাজে রত এমন পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে কখনও কখনও আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তখন নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা তথা সেই গ্রামের প্রতিটি প্রাণীর এক লম্বা সারি নতুন বাসস্থানের দিকে চলে যেতে দেখেছি — প্রত্যেকেই একটা বড় গোলাকার ঝুড়ি কপালের উপর এক ফালি নরম চওড়া চামড়া দিয়ে বেঁধে পিঠের উপর ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের কোঁকড়ানো লেজের কালো পাহাড়ি কুকুর রয়েছে। কোন কোন 'ঝুড়ি'তে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, আবার কোনটিতে একটি মানব শিশু ও একটি শূকর ছানা নির্বিঘ্নে একসঙ্গে ঘুমাচ্ছে। তাদের পুরানো গ্রামে সম্ভবত অর্ধেক মাল নির্ভয়ে ফেলে এসেছে কেননা পাহাড়ে কোনো চোর নেই। এই রকম পরিত্যক্ত গ্রামে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়, — গোলাঘরে অর্ধেক শস্য পড়ে রয়েছে, শস্য ভানার কাঠের গুঁড়ি, মেয়েদের তাঁতের যন্ত্রপাতি এবং কোনটিতে অর্ধেক বোনা কাপড় — এ সমস্তই তারা রেখে গেছে এবং অবসর সময়ে এসে এগুলি নিয়ে যাবে। তারা হয়ত দূরের গ্রামে (দুই দিনের পথ) গেছে। সেখানে পৌছার পর প্রত্যেক পরিবারকে নতুন ঘর তৈরি করতে হবে।" — Lewin, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

এই নিয়ম চাকমাদের মধ্যে দেখা যায় না। Lewin, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।

৯. মাতবর উপজাতিদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিজের কাছেই রাখে এবং সর্দারও মাতবরের কাছ থেকে তার অংশ নিয়ে নিজের কাছেই রাখে। কেবল নির্ধারিত তারিখে এই টাকা মাতবর সর্দারের কাছে এবং সর্দার সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করে।

১০. মাতবর সমতলভূমির খাজনা আদায়ের দায়িত্বও পালন করে। এইভাবে মাতবর ঝুমভূমি ও সমতলভূমি উভয়েরই খাজনা আদায় করে থাকে। অবশ্য সমতলভূমি থেকে আদায়কৃত টাকা সর্দারের কাছে না দিয়ে সরাসরি সরকারের কোষাগার বা ট্রেজারিতে (D.C) পাঠায়।[২]

মাতবর সমতলভূমি থেকে আদায়কৃত খাজনার কিছু কমিশন পেয়ে থাকে। এটা তার একটা আয়। মাতবর যদি সমতলভূমির চাষীদের সমস্ত খাজনার শতকরা ৮০ ভাগ আদায় করে তবে সে প্রতি টাকায় তিন আনা কমিশন পায়। আর যদি প্রত্যাশিত সমস্ত টাকার শতকরা ৮০ ভাগ না আদায় হয় তবে তার প্রাপ্যও সেইভাবে কমে যায়। এটা অর্থ-বছরের শেষে হিসাব-নিকাশ করা হয়।

যারা খাজনা দিতে পারে না মাতবর তাদের নামের একটা তালিকা প্রস্তুত করে সরকারের নিকট তা দাখিল করে। সরকার সার্টিফিকেট জারি করে এইসব খাজনা আদায় করে। তাদেরকে টাকা পরিশোধ করার জন্য সময় দেওয়া হয়। কিন্তু তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও যদি টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে পাওনা টাকার বিনিময়ে তা বিক্রি করা হয়।

১১. যার সমতলভূমি আছে সে তার দখলি স্বত্ব অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারে। নতুন দখলিকারের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। ভাল জমি হলে একর প্রতি ৪০০.০০ টাকা থেকে ৫০০.০০ টাকা ও ভাল জমি না হলে ২০০.০০ টাকা থেকে ৩০০.০০ টাকায় দখলি স্বত্ব বিক্রি করা হয়।

১২. যারা ঝুমভূমি দখল করে আছে মাতবর তাদের নামে দখলি স্বত্ব লিখে রাখে, তার কাছে ঝুম-চাষীদের পূর্ণ তালিকা থাকে। এই তালিকা সরকারের কাছে পাঠান হয় এবং যারা বার্ষিক ৬.০০ টাকা খাজনা দিতে পারে নি সরকার সমতলভূমির মতই সেসব ঝুম-চাষীদের প্রতি সার্টিফিকেট জারি করে। সার্টিফিকেটে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয়। যদি সেই সময়ের মধ্যেও সে তার টাকা পরিশোধ করতে না পারে তবে তার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে ৬.০০ টাকার পরিমাণ জিনিস বিক্রি করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে মাতবর যে অংশ পায়, সাধারণত সেটা সর্দারকে দেওয়া হয়। এই কারণে মাতবর চাষীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা আদায় করার জন্য তার সাধ্যমত চাপ দেয়।

১৩. মদন মাতবরের পাড়ায়, চন্দ্রমোহনের ভাইয়ের স্ত্রী একটা স্কার্ট (ঘাগরা) তৈরি করছিল, এটা আড়াই গজ লম্বা ও ১ গজের বেশি চওড়া। সে জানালো যে এটা শেষ হতে তার ১৫ দিন লাগবে — এর সুতা বাজার থেকে কিনে বাড়িতে রং করা হয়েছে।

---

২. প্রত্যেক মৌজাতে জমিতে হাল দেওয়ার খাজনা মাতবরই আদায় করে এবং সে সেই টাকা মহকুমা অফিসার বা ডেপুটি কমিশনারের কাছে দেয়। — *Chittagong Hill Tracts Manual*, p.35, article 43.

১৪. মদন মাতবরের পাড়ার চন্দ্রমোহনের মাটির ঘর ৬ বৎসর পূর্বে সমতলভূমির লোক অর্থাৎ বাঙালিদের দ্বারা তৈরি। ঘরটি নির্মাণের জন্য ১০ জন লোক দেড় মাস ধরে কাজ করেছিল এবং এর জন্য কেবল পারিশ্রমিকই দেওয়া হয়েছিল ৪০০.০০ (চার শত) টাকা। এর সব কটি দেওয়ালই মাটির তৈরি। ছাদের জন্য যেসব কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল তা বনের কাঠ ভোগ করার ক্ষেত্রে উপজাতিদের যে অধিকার রয়েছে সেই অধিকার বলে বিনামূল্যে বন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। একজন সমভূমির লোক সূত্রধরের কাজ করেছিল। খুঁটি পোতার জন্য তাকে অতিরিক্ত ৬০.০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ছাদ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নতুন করে করা হয়। এই রকম ঘর বাঁশের তৈরি ঘর (৬/৭ বৎসর) অপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল (২০ বৎসর) স্থায়ী হয়।

১৫. মদন মাতবরের পাড়ায় প্রতিজনের ঝুমভূমি গড়ে ২ থেকে ৩ একর। একটি একান্নবর্তী পরিবার ৬ একর পেতে পারে।[৩] গড়পড়তায় একটি ক্ষেতে (জমিতে) নিম্নরূপ নগদ মূলের ফসল পাওয়া যেতে পারে :

ধান = ৪০০.০০ থেকে ৫০০.০০ টাকার (৩০ মণ)

তুলা = ৪০০.০০ থেকে ৬০০.০০ টাকার (২ থেকে ৩ মণ)

কুমড়া = ২০.০০ টাকার

তিল = ৫০.০০ থেকে ৬০.০০ টাকার।

১৬. পাহাড়িরা নিজেরাই তাদের তামাক উৎপন্ন করে। বাড়িতে ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করলেও প্রতি একর হিসাবে আবগারী শুল্ক দিতে হয়।

১৭. একই পরিমাণ শস্য পেতে হলে সমতলভূমির থেকে ৮/১০ গুণ বেশি ঝুমভূমি একজনের প্রয়োজন।

১৮. পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্কেলের বাইরেও কতকগুলি সংরক্ষিত বন আছে। কোনো উপজাতিকে সেখানে বাস করতে দেওয়া হয় না। তবে বিশেষ চুক্তি অনুসারে কোন কোন লোককে সেখানে বসবাস করতে দেওয়া হয়। অধিকাংশ সময়ই তারা কয়েকটি মাত্র ঘরের এক একটি ছোট গ্রাম ক'রে বাস করে।

এই চুক্তি অনুসারে পাহাড়িয়াদের ঝুম-চাষের জন্য কিছু জমি দেওয়া হয়। তারা সেই জমির জঙ্গল পুড়িয়ে পরিষ্কার করে শস্য জন্মায়। এর প্রতিদানস্বরূপ তারা সেই জমির শস্য কাটার পর তাতে নতুন চারাগাছ লাগায়। একবার ঝুমভূমি ব্যবহার করে তাতে নতুন চারাগাছ লাগালে সে জমি আর ব্যবহার করা যায় না। তখন পাহাড়িয়াদের অন্য স্থানে সরে যেতে হয়। চুক্তি অনুসারে 'সংরক্ষিত বনে' তাদেরকে প্রতি বৎসর নতুন জমি দেওয়া

---

৩. "একজন লোক ও তার স্ত্রী প্রতি বৎসর ৯ কানি পাহাড়ি জমিতে ঝুম চাষ করতে পারে। যে পরিমাণ বীজ চাষের জমিতে বোনা হয় তা নিম্নরূপ :

৬ আরি রেডি, ৩ ডিটো তুলা, আধাসের ডাল, তরিতরকারি এবং শাকসব্জী ছাড়া অন্যান্য শস্য।" — Lewin, ১৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

হয়। পুনবনায়নকরণ পরিকল্পনা অনুসারেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। চারাগাছ লাগানো ছাড়াও ঝুম-চাষীদের ২০ থেকে ৩০ দিন বিনা পারিশ্রমিকে সরকারকে কাঠ কেটে দিতে হয়।

যদিও এইসব লোক খুব কম জমি পায়, তবুও তারা এই চুক্তিতে আসার জন্য আগ্রহান্বিত ; কারণ এইসব জমির খাজনা দিতে হয় না এবং যে জমি দেওয়া হয় তাতে খুব বেশি দিন ধরে ঝুম চাষ করা হয় না, ফলে জমির উর্বরতা শক্তিও খুব বেশি থাকে। যেসব স্থানে কোনো ঝুম ভূমি পাওয়া যায় না সাধারণত সেখান থেকেই এসব লোক আসে।

১৯. পাহাড়িয়ারা নিজেদের খাওয়ার জন্য যে-কোনো স্থান থেকেই মাছ ধরতে পারে। কিন্তু যাদের শুধু নিলামের মাধ্যমে অধিকার দেওয়া হয়েছে তারাই কেবল ব্যবসা করতে পারে। প্রায়ই সমগ্র নদীটাই নিলামে বিক্রি হয় ; কখনও কোনো মাতবর আবার কখনও কোন স্থানীয় লোক সেটা কিনে নেয়।

২০. যারা নদীতে ব্যবসায়ী নৌকা চালায় তারা 'বাজার-চৌধুরীকে' বাৎসরিক খাজনা দেয়। খেয়াঘাট নিলামে বিক্রয় হয়। এর মালিক খেয়াঘাট থেকে যে আয় হয় তার সম্পূর্ণটাই নিজের জন্য রাখে।

২১. বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ঝুমভূমির খাজনা নগদ অর্থে আদায় হতো না, ফসলের আকারে — যেমন, কয়েক বস্তা ধান ইত্যাদি খাজনা হিসাবে আদায় করা হতো। সর্দার সেই ফসল বিক্রি করে সরকারকে টাকায় খাজনা দিতো।

২২. হাতী পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত ও ভারী কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এ সমস্তই 'সরকারের হাতী'। হাতী সরকারি অফিসারদের মালপত্র বহন করে, যেসব স্থানে জিপ গাড়ি যায় না সরকারি লোকদের সেইসব স্থানে বহন করে নিয়ে যায় এবং কাঠের গুঁড়ি নদীর জলে ভাসানোর জন্য সাহায্য করে। প্রতিটি হাতীর মূল্য ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা। এরা প্রচুর আহার করে। কোনো সাধারণ পাহাড়িয়ার একটি হাতী পোষার ক্ষমতা নাই।

২৩. কেবল উপজাতীয়দেরই ঝুমভূমি চাষ করতে দেওয়া হয় ; বাঙালি কিংবা সামগ্রিক অর্থে বাইরের কাউকেই দেওয়া হয় না।

২৪. বাংলার অন্যান্য অংশের মত পার্বত্য অঞ্চলে কেউ অনাহারে মারা যায় না। চালের ঘাটতি দেখা দিলে পাহাড়িয়ারা বন্য ফলমূল, বিশেষ করে, এক রকম বন্য আলু খেয়ে বাঁচতে পারে।

২৫. মং সর্দার তার নিজস্ব এলাকায় মৎস্য চাষ শুরু করেছেন। একটা পুকুর তৈরি করে তা শুকিয়ে সেখানে লাঙ্গল দেওয়া হয়। পরে সেই কাদামাটিতে খইল ছড়ানো হয় এবং তারপর আবার পানি আসতে দেওয়া হয়। এগুলি মাছের খুব ভাল খাদ্য এবং তাদের বংশবৃদ্ধিতে খুব সাহায্য করে।

২৬. উপজাতীয় নয় এমন লোকদের পাহাড়িয়াদের কাছ থেকে জমির স্বত্ব কিনতে দেওয়া হয় না।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি

১. সাধারণত পিতার পর পুত্রই মাতবরের স্থান দখল করে। সর্দার তাকে অনুমোদন করলে সরকার তাকে নিয়োগ করে। যদি পুত্র অযোগ্য হয় তবে অন্য লোক সর্দারের নিকট মাতবরের পদের জন্য দরখাস্ত করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রেও উপরে বর্ণিত নিয়মই অনুসরণ করা হয়।

২. মদন মাতবরের পাড়ার চন্দ্রমোহনের নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকে পিতৃধারা ও বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্য জানা যায়ঃ

"আমি বিয়ে করতে পারি না — আমার ভাইয়ের মেয়েকে, আমার চাচাত বোনকে, আমার ফুফাত বোনকে, আমার বোনের মেয়েকে।

আমি বিয়ে করতে পারি — আমার মামাত বোনকে, আমার খালাত বোনকে।"[৪]

৩. পাহাড়িয়ারা তাদের শব দাহ করে থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তবে কলেরা বা বসন্ত রোগে কেউ মারা গেলে তাকে কবর দেওয়া হয়। যেহেতু স্ত্রীকে স্বামীর পরিবারের অঙ্গ বলে মনে করা হয় সেহেতু তাকে স্বামীর গ্রামেই পোড়ান হয়। পুরুষদের মতো তার এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও গ্রামের লোক যোগ দেয়। তবে যে পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল, সম্ভব হলে সেই পরিবারের সদস্যরাও এসে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

৪. মদন মাতবরের পাড়াতে একটা স্কুল আছে। ছেলেমেয়েরা ৬/৭ বৎসর বয়সে এই স্কুলে আসে এবং ২ বৎসর কাল পড়াশুনা করে। শিক্ষক মাসিক প্রায় ২০.০০ টাকা বেতন পায়। এটা তার জীবিকার জন্য যথেষ্ট নয়, তাই সে ঝুমভূমি চাষ করে। সাধারণত দেখা যায় যে শিক্ষক সেই গ্রামেরই লোক।

৫. কিছুসংখ্যক ছেলেমেয়ে খ্রিষ্টান মিশনারিদের দেওয়া ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করে।

৬. মাতবরদের কোনো রকম সংগঠন বা সমিতি নেই। যখন বৎসরে একবার সর্দার তাদের খাজনা দিতে ডাকে তখন কেবল তারা একত্রিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মৌজাতে একজন করে মাতবর থাকে, যদিও কোনো কোনো মৌজায় দুইজন মাতবর আছে। চাকমা সার্কেলে সর্বমোট ১৭৫ জন মাতবর আছে।

---

৪. চাকমাদের সম্বন্ধে লিখিত Levi-Strauss -এর বিবরণ তুলনীয়
"নীতিগতভাবে বিয়ে বংশানুক্রমে সাত পুরুষের মধ্যে নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিন বা চার পুরুষের মধ্যে কোনো সম্পর্কের সূত্র না পাওয়া গেলে বিয়ে হতে পারে। কোন কোন সংবাদদাতা জানান যে ফুফাত বোন, মামাত বোন এবং খালত বোনের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে।" —Levi-Strauss, *Kinship Systems*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৭. ব্যভিচার করলে চাকমাদের মধ্যে (অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যেও) উভয় অপরাধীকেই গ্রামবাসীদের জন্য একটি করে শূকর দিতে হয়। এছাড়া (সর্দার বা মাতবরের) বিচারালয়ে জরিমানা দিতে হয়। যে-কোন লোক এই ব্যভিচারের সংবাদ দিতে পারে।

যদি অবিবাহিত লোককে এই কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায় তাহলে তাকেও ঐ একই রকম শাস্তি দেওয়া হয়। যদি নিকট-সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গম দেখা যায় তবে অপরাধীদের মাথার অংশবিশেষ কামিয়ে দেওয়া হয়। [৫]

৮. তনচাঙ্গিয়াদের মধ্যে এটা খুব সাধারণ ব্যাপার যে ছেলেরা তাদের চেয়ে বেশি বয়স্কা মেয়েদের বিয়ে করে থাকে।

৯. অস্থায়ীভাবে শ্বশুরালয়ে (স্ত্রীর বাপের বাড়ি) বাস করার নিয়ম হলো — শ্বশুরের সঙ্গে দুই ঝুম পর্যন্ত বাস করা। এরপর তারা অন্য নতুন স্থানে চলে যায়।

১০. চাকমাদের মধ্যে যুবক ছেলেমেয়েরা গ্রামে এক সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা একসঙ্গে ঝুমভূমিতেও যায়। কোন কোন সময় এমনও হয় যে পরিণতির কথা না ভেবেই কোন এক মুহূর্তের বশবর্তী হয়ে যুবক-যুবতীযুগল কুঞ্জবনের অন্তরালে চলে যায়। সাধারণত এটাই পরে বিয়ের দিকে মোড় নেয়।

এটা অস্বাভাবিক নয় যে বাবা-মায়ের দেওয়া বিয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই দুইজন যুবক-যুবতী একে অপরের প্রতি আসক্ত হতে পারে। যদি মেয়ের পিতার এ বিয়েতে অসম্মতি থাকে, তাহলে প্রেমিকযুগল পালিয়ে যেতে পারে। পালিয়ে তারা অন্য স্থানে চলে যায়, যেমন কোনো আত্মীয়ের বাড়ি। এই আত্মীয় তখন এদের বিয়ের জন্য মেয়ের বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালায়। মেয়ের বাবা এ বিয়েতে মত দিতেও পারে, আবার আদালতের আশ্রয়ও নিতে পারে। প্রেমিকযুগলকে তখন জনসমক্ষে আনা হয় এবং মেয়েকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কারণ প্রেমিকযুগল মেয়ের বাবার মতামতের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। এই পলায়ন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবার কথাই বড়। বাবা তখন মেয়েকে অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এমতাবস্থায় মেয়ে আবার পালিয়ে যেতে পারে। তিনবার পর্যন্ত বাবা তার মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু চতুর্থবারে ছেলে মেয়েটিকে রেখে দিতে পারে এবং বিয়ে করতে পারে।

ছেলেটি সে রকম উপযুক্ত স্বামী নাও হতে পারে, তবুও এরকম পালিয়ে যাওয়া মেয়েকে কোনো অপবাদ দেওয়া হয় না। ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের বেলাতেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য।

---

৫. "যদি কোনো লোক অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত স্বামীকে পূর্বের বিয়ের সমস্ত খরচ উপরন্তু ৪০.০০ টাকা থেকে ৬০.০০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হবে। যদি দুই নিকট-আত্মীয় (যাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে কিছুটা বাধা আছে) পরস্পরের প্রেমে পড়ে তবে প্রথা অনুসারে তাদের উভয়কেই ৫০.০০ টাকা জরিমানা দিতে হয় এবং শারীরিক শাস্তিও প্রদান করা হয়।" — Lewin, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৫।

১১. চাকমাদের মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা কিংবা সংক্রামক ব্যাধির জন্য পরস্পরের সম্মতি ক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদের রেওয়াজ আছে। এমন কি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাবের অভাব দেখা দিলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও ব্যভিচার চাকমাদের ভিতর খুবই বিরল। কিন্তু মগদের মধ্যে এ রকম নয়। যেখানে পরস্পরের সম্মতি থাকে না এ রকম বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার নিষ্পত্তি আদালতই করে থাকে।

১২. যদিও কোনো বিধি নিষেধ নাই তবুও আন্তঃউপজাতীয় বিয়ে খুবই বিরল। চাকমা ও মগদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বিয়ে হয়েছে, গত কয়েক পুরুষে। উপজাতি ও বাঙালিদের মধ্যে বিয়েও খুব বিরল — বর্তমানে 'মং' সার্কেলে এ ধরনের কেবল তিনটি দৃষ্টান্ত আছে। এসব ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং কদাচিৎ তা মঞ্জুর করা হয়। সাধারণত জনসাধারণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এই নিষেধাজ্ঞাই যথেষ্ট।

১৩. বিচার-প্রশাসন ক্ষেত্রে মাতবর নিম্নআদালতের কাজ করে এবং সর্দার প্রথম আপিল আদালত (appellate court) হিসাবে কাজ করে। তার পরে আসে ডেপুটি কমিশনার এবং তার উপরে ডিভিশনাল কমিশনার।

উপজাতীয় আদালত কেবল বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌতুক এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত বিচার করার ক্ষমতা রাখে। এসব ছাড়া অন্য সমস্ত মামলা সরকারি আদালতে যায়। প্রথমে পুলিশ বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ও পরে আপিল করলে তা ডেপুটি কমিশনারের কোর্টে যায়। যাবতীয় ফৌজদারি মামলা সরকারি কোর্টে বিচার্য। সমস্ত মামলাই চূড়ান্ত রায়ের জন্য হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে।

পার্বত্য অঞ্চলে খুন ছাড়া সরকারি বা উপজাতীয় মামলা কোনো পেশাদার আইনজীবীকে পরিচালনা করতে দেওয়া হয় না। অধিকাংশ মামলাই অপরাধীর স্বীকারোক্তিতেই নিষ্পন্ন হয়। পাহাড়িয়ারা খুবই সাদাসিধে মানুষ, তারা সাধারণত সত্যকে গোপন করে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিরপরাধ মনে করা হয় এবং এ ব্যাপারে বৃটিশ আইনই অনুসৃত হয়ে থাকে।

১৪. আজকাল একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই কারণে যে বেশ কিছু সংখ্যক পাহাড়ি এই অঞ্চলে ঠিকাদারদের অধীনে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে। কর্মব্যাপদেশে বাইরে থাকার জন্য তারা তাদের স্ত্রীদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কাছে রেখে আসতে বাধ্য হয়, যদিও এর দরুন প্রায়ই পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হয়।

১৫. পার্বত্য অঞ্চলে কলেজে পড়া ছাত্রদের জন্য বছরে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা খরচ করা হয়। ভবিষ্যতে কিছু ছাত্রকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা আছে।

১৬. গ্রাম স্থাপনের ব্যাপারে কিছুটা দিক নির্ণয়ের স্বাধীনতা আছে। যাহোক নিম্নবর্ণিত অবস্থানই বেশি পছন্দ করা হয় :

পূর্ব দিকে মুখ করে নদী সামনে রেখে গ্রাম গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কদাচিৎ গ্রামের পিছন দিকে নদী দেখা যায়।

১৭. মাত্র ৩ জন ডাক্তার পার্বত্য অঞ্চলে আছে; বস্তুত তারা সরকারি কর্মচারী।

১৮. 'গনখুলি'রা হলো এক রকম চারণ কবি, যারা গান গেয়ে গেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের এই সমস্ত গান ও গল্পকাহিনী পৌরাণিক কাহিনী গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এ সমস্ত কাহিনী ও গানের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক উপাদানও থাকতে পারে। চাকমাদের মধ্যে চারণ কবিদের দু'টো মহাকাব্য আছে, যথা—'চাডিগাং ছারা' (কেমন করে আমরা চট্টগ্রাম ছাড়লাম) ও 'রাধামোহন' (চাকমা 'সেনাপতি' ও তার মেয়ের গল্প)।

১৯. চাকমাদের মধ্যে শিশু জন্মালে বন্দুকের আওয়াজ করা হয়—ছেলে হলে জোড় এবং মেয়ে হলে বিজোড় সংখ্যক আওয়াজ করা হয়।

২০. ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের কাছে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা মতামত দিতে পারে না। কিন্তু বাবা-মা ছেলেমেয়েদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের ইচ্ছার কথা জেনে নেয় এবং এই ইচ্ছাকে বিবেচনা করে দেখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যে নবদম্পতি বিয়ের পূর্বেই একে অপরের কাছে পরিচিত ছিল।

২১. চাকমাদের মধ্যে বিয়েকেই একমাত্র যৌন অভিজ্ঞতা বলে ধরা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধারণা বিদ্যমান। তবে তনচাঙ্গিয়াদের একটি গোষ্ঠীতে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা নেই। একজন যুবক কতবার যৌনক্রিয়া করেছে তার হিসাব রাখে। অবশ্য এই বাছ-বিচারহীন যৌন সম্ভোগকে উৎসাহিত করা হয় না, কারণ এটা সাধারণত বিয়েতেই পরিণতি লাভ করে।[৬]

---

৬. "ইউরোপীয়দের মতে 'খাইয়াংথা'দের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের মান নিচু। বিয়ের পূর্বে একজন কুমারী মেয়ে তার প্রেমিকের মিনতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে গুরুতর পাপ বলে মনে করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে বিয়ের পূর্বে মেয়ের ২ বা ৩ জন প্রেমিক থাকে। বিয়ের পূর্বে যৌন-সম্ভোগ প্রায় পুরাপুরি বাধাহীন, যদিও এ ব্যাপারে খাইয়াংথারা অন্যান্য বন্য উপজাতির থেকে কিছুটা কঠোর। বিয়ের পরে সতীত্ব রক্ষা করাই নিয়ম, কদাচিৎ অসতী স্ত্রীর কথা শোনা যায় এবং এটা অস্বাভাবিকও নয়, কারণ পাহাড়ী অঞ্চলে বিয়ে পারস্পরিক আসক্তিরই ফল, এটা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার নয়। যে সব মেয়ে তাদের প্রথম প্রেমিককে বিয়ে করে, তাদের সেই অস্থির প্রেমিকরা এই পাহাড়ে আসে ও ফুল ফেলে রেখে যায়। মেয়েরা ১৬ বৎসর বয়সের সময় বিয়ে করে এবং ছেলেরা ১২ বৎসরে পৌঁছাবার পূর্বেই স্ত্রী গ্রহণের কথা চিন্তা করে। কোনো কোনো সময় মেয়েরা বিনীতভাবে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়াকে অবমাননা মনে করে না। আমাদের এক পুলিশ কনেস্টবল এক সপ্তাহের ছুটির জন্য আমার কাছে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন? সে বলল, "অমুক গ্রামের একজন কুমারী মেয়ে আমাকে দুইবার ফুল ও বিরণীর চাল পাঠিয়েছে—এখনও যদি আমি অপেক্ষা করি তবে তারা বলবে আমি পুরুষই নই।"
"আমি এখানে আরও উল্লেখ করতে চাই যে, বিয়ের পর কোন সুখী স্বামী তার স্ত্রীর (যে পৃথক স্থানে ঘুমায়) সঙ্গে দৈনিক ৭ বার করে ৭ দিন না-খাওয়া পর্যন্ত সহবাস করে না। বিয়ের পর ছোট ভাই বড় ভাইয়ের স্ত্রীর হাত স্পর্শ করতে পারে এবং তার সঙ্গে কথা বলতে ও হাসি-ঠাট্টাও করতে পারে। কিন্তু বড় ভাইয়ের পক্ষে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর দিকে তাকানোর কথা চিন্তা করাও অশালীন। সাঁওতালদের মধ্যে কমবেশি এই নিয়ম প্রচলিত।" — প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭ ও ৫১।

২২. যদিও ভাইবোনেরা একই কক্ষে বাস করে, কিন্তু তারা কখনও একে অপরের কাছে নিজের বিবস্ত্র রূপ প্রদর্শন করে না।

২৩. ম্রোদের মধ্যে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা মুখে ও শরীরে লাল পালিশ লাগায়। ছেলেরা দাঁতে কালো রং দেয়।

২৪. ম্রোদের ভিতর বিবাহিতা মেয়ে সব সময় তার স্বামীর পরিবারের সঙ্গে বাস করে। কিন্তু অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

'দেওয়াই মাতবরের পাড়াতে' মাতবর জানত যে সেখানে একজন ঘরজামাই আছে, কিন্তু কেউ এটা পছন্দ করে না।

২৫. অন্যান্য উপজাতির মতো ম্রোদের মধ্যেও অস্থাবর সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তবে চাচাত ভাইয়েরাও ইচ্ছা করলে এই ভাগের অংশ নিতে পারে।

তথ্যদাতাদের নাম উল্লেখ

(ক) অর্থনৈতিক জীবনধারা ও রাজস্ব সংগ্রহ

১.	তথ্যদাতা	প্রিয়দর্শন দেওয়ান
২.	ঐ	ঐ
৩.	ঐ	ঐ
৪.	ঐ	ঐ
৫.	ঐ	ঐ
৬.	ঐ	ঐ
৭.	ঐ	ঐ
৮.	ঐ	ঐ
৯.	ঐ	ঐ
১০.	ঐ	ঐ
১১.	ঐ	ঐ
১২.	ঐ	ঐ
১৩.	ঐ	চন্দ্রমোহন
১৪.	ঐ	ঐ
১৫.	ঐ	চন্দ্রমোহন ও অন্যান্য গ্রামবাসী
১৬.	ঐ	প্রিয়দর্শন দেওয়ান
১৭.	ঐ	নাম লিপিবদ্ধ করা হয় নি
১৮.	ঐ	মাইনিমুখের ফরেস্ট অফিসার
১৯.	ঐ	ঐ
২০.	ঐ	ঐ
২১.	ঐ	মং সর্দার

২২.	তথ্যদাতা	মং সর্দার
২৩.	ঐ	ঐ
২৪.	ঐ	ঐ
২৫.	ঐ	ঐ
২৬.	ঐ	প্রিয়দর্শন দেওয়ান

(খ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি–নীতি

১.	তথ্যদাতা	প্রিয়দর্শন দেওয়ান
২.	ঐ	চন্দ্রমোহন
৩.	ঐ	ঐ
৪.	ঐ	ঐ
৫.	ঐ	প্রিয়দর্শন দেওয়ান
৬.	ঐ	চাকমা সর্দার
৭.	ঐ	ঐ
৮.	ঐ	ঐ
৯.	ঐ	ঐ
১০.	ঐ	ঐ
১১.	ঐ	ঐ
১২	ঐ	মং সর্দার ও এস. ডি. ও. আহমেদ সাহেব
১৩.	ঐ	মং সর্দার
১৪.	ঐ	ঐ
১৫.	ঐ	ঐ
১৬.	ঐ	ঐ
১৭.	ঐ	ঐ
১৮.	ঐ	চাকমা সর্দার
১৯.	ঐ	ঐ
২০.	ঐ	ঐ
২১.	ঐ	ঐ
২২	ঐ	ঐ
২৩.	ঐ	দেওয়াই মাতবর
২৪.	ঐ	ঐ
২৫.	ঐ	ঐ

পরিশিষ্ট-২

নিম্নলিখিত দলিলগুলি চাকমা রাজপরিবারের সংরক্ষণাগার থেকে পাওয়া গেছে। চাকমা সার্কেলের সর্দার ক্যাপ্টেন রাজা ত্রিদিব কুমার রায়ের বাড়িতে আসার পর তিনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য কিছু কাগজ-পত্র দিলেন। আমার মনে হয়, এগুলি দলিল হিসাবে প্রকাশ হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সেইজন্য আমি রাজা ত্রিদিব রায়কে জিজ্ঞাসা করলাম এই প্রবন্ধের সঙ্গে সেগুলি প্রকাশ করতে তিনি অনুমতি দেবেন কিনা। তার উত্তরে তিনি বললেন :

"এতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনার প্রবন্ধের পরিশিষ্ট আকারে এগুলি থাকবে।

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও **খ.** চাকমা সার্কেলের উপজাতি— এই শিরোনামের রচনাগুলি প্রকাশিত হয়নি। এগুলি সংক্ষিপ্ত রচনা যা—

ক. আমার নিজের লেখা।

খ. আমার বাবা ও আমার লেখা।

গ. "চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাস" আমার পিতামহ রাজা ভুবন মোহন রায়ের লিখিত।

ঘ. তরজমাসহ গানগুলি আমার পিতা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের রচনা।

গ. ও ঘ. আমাদের পারিবারিক পত্রিকা 'গৈরিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমার স্মরণ নেই।" (১ জুন, ১৯৫৭ সন)

এই সব রচনা (দলিল) কোন রকম পরিবর্তন না করেই হুবহু প্রকাশ করা হল। বিষয়বস্তুর জন্য একমাত্র লেখকরাই দায়ী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক রকম উপজাতি আছে, যেমন — চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, তনচাঙ্গিয়া, বানজুগি, পাংখো, মুরং, লুসাই, চাক, খুমি প্রভৃতি। প্রত্যেকটি উপজাতি তাদের নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলে।

চাকমা উপজাতি

এই উপজাতি ভারতীয় আর্য দলের বংশধর। এরা অত্যন্ত উন্নত এবং সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশি। এরা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরও বেশি এবং অসংখ্য গোষ্ঠী বা গোজায় বিভক্ত। একেবারে গোড়ার দিকে কেবল ৪টি সম্প্রদায় ছিল, যথা—ধুইয়া, কুর্য, ধাবানা এবং পিরাভাঙ্গা। এগুলির থেকে পরে নানা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। গোজা বা গোষ্ঠীর ভিতর ওয়াংসা, মুলিমা, ধামাই, লারমা, কুরাকুত্তা, বারুগা, বগা প্রভৃতি প্রধান। এগুলি ছাড়াও সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে প্রত্যেক গোজায় দেওয়ান বা তালুকদার, খিসাস এবং কারবারী থাকে। মৌজার প্রধান হচ্ছেন মাতবর (পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি সার্কেলে বিভক্ত, এই সার্কেলগুলি আবার মৌজায় বিভক্ত)। কতিপয় উপজাতিকে নিয়ে গঠিত একটি সার্কেলের প্রধান হচ্ছেন সর্দার। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে কোনো বাধা নাই।

চাকমাদের গায়ের রং সাধারণত ফর্সা এবং তাদের শারীরিক গঠন জলবায়ু ও মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে অন্তর্বিবাহ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। তারা শারীরিক গঠন ও আকৃতিতে কমবেশি মঙ্গোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। তারা সুগঠিত বুক, পেশল হাত এবং বলিষ্ঠ পায়ের অধিকারী। অহরহ তাদের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়, পাহাড়ে উঠতে হয় এবং পাহাড়ের ঢালে অদ্ভুত ধরনের ঝুম পদ্ধতিতে চাষ করতে হয় বলেই বোধহয় তারা সুগঠিত দেহের অধিকারী। তাদের আঞ্চলিক ভাষা হলো চাকমা—বিকৃত বর্মীভাষায় লিখিত বিকৃত ধরনের বাংলা।

জীবিকা : তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হলো ঝুম-চাষ। এটা একটা অদ্ভুত পদ্ধতির কৃষিকার্য যা গবাদিপশু বা লাঙ্গলের ব্যবহার ছাড়াই পাহাড়ের উপর বা ঢালুতে করা হয়। 'দা' হলো তাদের প্রধান অস্ত্র। এর সাহায্যে তারা জঙ্গল কেটে একমাসের মত রৌদ্রে শুকানোর জন্য রেখে দেয়। তারপর এপ্রিলের প্রথম পক্ষকালে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর গাছের গুঁড়ি ও মাটির নিচে শিকড়-বাকড় উপড়িয়ে ফেলে ঝুম পরিষ্কার করা হয় এবং বৃষ্টি হওয়ার পর ধান, তুলা, শসা, তিল, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ একটা ঝুড়িতে নিয়ে একত্রিত করে জমিতে দায়ের সাহায্যে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে ঐ মিশ্রিত বীজ কিছু কিছু অংশে ভাগ করে তাতে ফেলা হয়। তবে যখন সমতলভূমি পাওয়া যায়, পাহাড়িয়ারা তখন ষাঁড় ও মহিষ দিয়ে 'লাঙল চাষ' ও করে থাকে। এই কৃষিপদ্ধতি (লাঙল চাষ) তারা সমতলভূমির লোকদের কাছ থেকে শিখেছে। ফসল কাটার প্রধান কারিগরি অস্ত্র হলো কাস্তে। (ঝুমিং দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ভারতেও দেখা যায়?)

ঘর : তাদের ঘরগুলি সম্পূর্ণ বাঁশের তৈরি এবং এগুলি বাঁশ বা কাঠের খুঁটির সাহায্যে মাটি হতে ৪ থেকে ৬ ফুট উঁচু হয়। মেঝে ও দেয়াল বাঁশ চিরে করা হয় এবং ছাদ ছন

ঘাস, বাঁশের পাতা, কুরুক পাতা (এক রকম পাহাড়িয়া পাতা) প্রভৃতি দিয়ে ছাওয়া হয়। "পিজারের' দুই পাশে দুটো কাঠের মই থাকে ; আঙ্গিনার মতো খানিকটা খোলা জায়গা ঘরের সামনে থাকে। একটা মই উঠে গেছে ব্যক্তিগত কক্ষ বা 'পিজারের' দিকে এবং অপরটি চানা (বারান্দা) ও সিংকোবা বা অতিথি কক্ষের দিকে। এই অতিথি কামরা প্রত্যেক বাড়িতেই দেখা যায়। এটা হলো উপজাতিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এতেই তাদের আতিথেয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঘরের ভিতর প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেকেই মইয়ের কাছে রক্ষিত জলপাত্র থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে নেয়। ঘরের নিচে (অর্থাৎ মাচানের নিচে) খোলা জায়গা গৃহপালিত পাখি, শূকর, ছাগল প্রভৃতি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম : যদিও তারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তবুও তারা আদিম প্রকৃতি–পূজার কোনো কোনো আচার–আচরণ পালন করে থাকে (হিন্দু প্রভাব)।

রীতি–নীতি : প্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে তাদের মধ্যে বিদ্যমান। যদিও বহু–বিবাহ অনুমোদিত তবুও এর দৃষ্টান্ত বিরল। বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে পারে। নানা কারণে বিবাহ–বিচ্ছেদ হতে পারে, যেমন— স্ত্রীর ব্যভিচার, সংসার কর্মে অবহেলা, সংক্রামক রোগ প্রভৃতির কারণে স্বামী এবং স্বামীর নিষ্ঠুরতা, সংক্রামক ও অনারোগ্য ব্যাধি, পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতির কারণে স্ত্রী বিবাহ–বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। যৌতুক বা 'ডাফা' দেওয়ার প্রথা আছে। বরের বাবা কনের বাবা বা অভিভাবককে যৌতুক দেয় — অবশ্য অবস্থানুসারে এর তারতম্যও হয়।

গোপনে পলায়ন : যদিও বিয়ের ব্যাপারে মাতা–পিতার সম্মতির দরকার হয় তবুও মেয়ে যদি পর পর ৪ বার গোপনে পলায়ন করতে পারে, তবে মাতা–পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তার প্রেমাস্পদকে বিয়ে করতে পারে, অবশ্য যদি তাদের সম্পর্ক নিষিদ্ধ কিছু না হয়। যা হোক, প্রতিবার পলাতক যুগলকে অপরাধের দণ্ড হিসাবে জরিমানা ও দুটো শূকর দিতে হয়। (এমতাবস্থায় মেয়ের পিতাকে অযোগ্য মনে করা হয়। সর্দার তখন অন্য অভিভাবক নিযুক্ত করে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বিয়ের অনুমতি দেয়।)

বিবাহ : চুমুলাং ও জারগেট (বিবাহ গিট) বিয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথমে জারগেটবন্ধন দেওয়া হয়। বর–কনে পাশাপাশি বসে। কনে বরের বাম পাশে বসে। তারপর ঠাট্টা–তামাশা করতে পারে এমন সম্পর্কে ১ জন পুরুষ ও ১ জন স্ত্রীলোক এসে তাদের (বর ও কনে) কোমর একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়। এটাকেই "বিবাহ গিট" বলে। বিবাহ–গিট দেওয়ার পূর্বে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়। এই প্রথা স্মরণাতীতকাল থেকে চলে আসছে। এর তাৎপর্য নিম্নরূপ :

ক. সমাজের সদস্য হিসাবে উপস্থিত ব্যক্তিদের অনুমতি নেওয়া।

খ. এ বিয়েতে কারও আপত্তি থাকলে, সেটা বলার সুযোগ দেওয়া।

কথিত আছে যে, বিবাহ-গিট দেওয়ার পর যে আগে উঠে দাঁড়াবে সে অপরের উপর কর্তৃত্ব করবে। তারপর বর ও কনে তাদের মুরব্বিদের কাছে যায়। গুরুজনেরা ধান (খাদ্যের প্রতীক), দুর্বা (সাফল্যের প্রতীক) ও তুলা (কাপড়ের প্রতীক) দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করে। জারগেট হয়ে যাওয়ার পর বা পরের দিন "চুমুলাং" পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরী হলো তাদের বিয়ের দেবদেবী।

জারগেট ও চুমুলাং এই উভয় অনুষ্ঠান গ্রাম্য পুরোহিত 'ওঝা' পরিচালনা করে থাকে।

উৎসব : "বিজু" (নববর্ষ) ও সর্দারের "পানাহা" হলো প্রধান উৎসব। অবশ্য ভাল ফসল, সম্প্রদায়ের সার্বজনীন মঙ্গল, অসুখ-বিসুখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদির জন্য তারা পূজা-অর্চনা করে থাকে।

সঙ্গীত : প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো বাঁশের বাঁশী। সব তরুণই এই বাঁশী বাজায়। "খানগারাং" হলো বাঁশের তৈরি জটিল ধরনের যন্ত্র যা মেয়েরাই বাজায়। প্রধান মহাকাব্যধর্মী কবিতার অন্যতম হলো "চাঁটিগা চারা" (যে গানের মাধ্যমে চাকমারা কেমন করে চট্টগ্রামে থেকে এল তা বলা হয়)। আরেকটি হলো উপকথার "তানাবী"—এটাতে তানাবীর রূপ ও লাবণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা অনেক বিরহীর মনকে নাড়া দিয়ে যায়। গৃহকর্ত্রীদের সুরেলা ছোট ছোট ঘুমপাড়ানী গানও কম উল্লেখযোগ্য নয়। আর একটি ধর্মীয় দীর্ঘ গান আছে, তাকে বলা হয় "গজেনালামা"। গজেন বা গোসাই অর্থ হলো সর্বশক্তিমান। এছাড়া অন্যরকম গানও আছে, যেমন— "উভাগীত" (তারুণ্যের গান), যা সব যুবকই গেয়ে থাকে। চাকমাদের ভিতর "গানকুলি" বা গায়কদল দেখা যায়, তারা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মহাকাব্যের খণ্ড খণ্ড অংশ, প্রেমের গান ও ঐতিহাসিক গান গেয়ে থাকে। সর্বত্রই তারা সাদরে অভ্যর্থিত হয়ে থাকে। দিনের শেষে নির্মল শীতের রাত্রে 'গানকুলি' আগুনের পাশে বসে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে সুর তুলে এক কাব্যিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। তার চারপাশে বসে থাকে গ্রামের লোকজন। বয়স্করা হুঁকা টানে এবং গানের তালে তালে মাথা দোলায়। ছেলেমেয়েরা গানের ধুয়া ধরে এবং পরিবেশটা জমজমাট করে তোলে।

খেলাধুলা : হা-ডু-ডু খেলা, ফার খেলা, লাটিম খেলা, কুস্তি, রশি টানা, সাঁতার, দৌড় প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ছেলেদের প্রিয় খেলা এবং পাটি খেলা, গিলা খেলা (এক রকম সুপারী জাতীয় ফল দিয়ে খেলা) প্রভৃতি মেয়েদের প্রধান খেলা।

পোশাক : মেয়েরা লম্বা চুল রাখে। পুরুষেরা ধুতি, গামছাকানী, ঘরে বোনা কোট ও মাঝে মাঝে মাথায় পাগড়ী বা 'খাবাং' পরিধান করে থাকে। মেয়েরা 'পিনান' (স্কার্ট), 'খাদি' (বক্ষ-বন্ধনী) ও খাবাং পরে থাকে ; অবশ্য মাঝে মাঝে শাড়ী-ব্লাউজও পরে। 'পিনান' হলো ঘরে বোনা উপরে ও নিচে লাল ডোরা কাটা এবং একধারে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত 'চাবুকী' নামে পরিচিত ফুলের সূচিকর্ম করা ঘাগড়া বা স্কার্টবিশেষ। এটা কোমর থেকে পায়ের গিট পর্যন্ত জড়িয়ে পরা হয় এবং এর নিচের দিকে খোলা থাকে। 'খাদি' হলো ২ ফুট চাওড়া ও ৬ ফুট লম্বা রঙ্গীন নকশা করা এক টুকরা সুন্দর বোনা কাপড় যা বক্ষ বেষ্টন করে পরা হয়। তিনরকম 'খাদি আছে : (১) চিবুট্রানা হলো সাধারণ খাদি — এটা বৃদ্ধাদের জন্য, (২) ফুল খাদি সাধারণত মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্য এবং (৩) রাঙাখাদি যুবতী বা অল্প বয়সের মেয়েদের জন্য।

যে সমস্ত কাজকর্ম মেয়েরা করে থাকে

ক. বয়ন কাজ : এটা চাকমা মেয়েদের একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ এবং যখন কোনো মেয়েকে পছন্দ করা হয় তখন তার এই বিশেষ গুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের জটিল ও ব্যাপক কারুকার্য খচিত বস্ত্রকে বলা হয় "আলম"। একে মিশরের সুবিখ্যাত কারুকার্যময় বস্ত্রাদির সঙ্গে তুলনা করা যায়। এটা হৃদয়গ্রাহী শিল্পকলাও বটে। কতকগুলি নমুনার নাম হলো — 'বেগুন বিচি', গাছ ছাবাং-পাডী ছাবাং, বাঘা চোখ প্রভৃতি। 'বেন' বা হস্তচালিত তাঁতের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হলো—তাগালক, তাপসী, চাম ও তার দড়ি, তারাম, সুচাক বাচ, বাওকাদী, তামুর বাচ, বাআং, থুর চুমা, কুদুক-কাদাক বা চিবাং, সিয়াং প্রভৃতি। সবরকম কাপড় এই "বেনে" বোনা হয়।

খ. সুতাকাটা : মেয়েরা প্রথমে চরকীর সাহায্যে তুলার বীজ ফেলে দেয়, তারপর 'ধানু' বা 'ধুনুনি'র সাহায্যে তুলাকে নরম, ঢিলা ও স্ফীত করা হয়। এরপর 'পেচ' নামে পরিচিত একটি দণ্ডে তা জড়ানো হয়। তারপর চরকার সাহায্যে সুতা কাটা হয়।

গ. রং করা : তারা দেশীয় কায়দায় সুতার রং করে। নীল বা কালো রং তৈরি করার জন্য "কালমা" বা "নীল" গাছের পাতা একটি জলপূর্ণ মাটির পাত্রে দুই দিন ভিজিয়ে রাখা হয়। কালো রং পেতে হলে "কালা গাব" গাছের ছাল সিদ্ধ করতে হয়। লাল রং "রং গাছ" নামক গাছের শিকড় থেকে পাওয়া যায়। হলুদ ও সবুজ রংও তৈরি করা যায়। প্রথমটি (হলুদ) হলুদ ও আম গাছের ছাল মিশ্রণে এবং নীল ও হলুদের মিশ্রণে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চমৎকার সবুজ রং পাওয়া যায়। প্রত্যেক রং তৈরির প্রণালী পূর্ববর্ণিত নীল রং তৈরির পদ্ধতির মতো।

ঘ. তারা মদ চোলাই করে নেয়। নদী বা ঝর্ণা থেকে মাটির কলসিতে করে পানি আনে, ঢেঁকির সাহায্যে ধান থেকে চাল বের করে, চাল দিয়ে নানা রকম পিঠা তৈরি করে এবং ঘর-সংসারের অন্যান্য কাজ করে। তারা পুরুষদের সঙ্গে ঝুম-চাষের কাজও করে থাকে।

অলঙ্কারাদি : চুলের কাটা—চারাং বা চেন শুদ্ধ চারুক, চুলা ফুল (চুলের ফুল)।

কানের দুল—জামুলী, করম ফুল বা কাজা ফুল, রাজুর, কানফুল প্রভৃতি।

গলার মালা ও হার—চিক, হাসুলী, তে'লহরী ছড়া, হাল ছড়া, টেনগা ছড়া, পিজী ছড়া (পুঁতির) প্রভৃতি।

অনন্ত—তাজুর, বাজু।

বলয় বা মল—কুজি খাড়ু, বালা খাড়ু, বাহু, হাতীর দাঁতের বালা।

নাকফুল বা নথ—সোনা নথ, নাকফুল। মাত্র কয়েকটি অলঙ্কার সোনার তাছাড়া আর সমস্তই রূপার হয়ে থাকে।

শবদাহ : তারা শব দাহ করে থাকে এবং ৭ দিন ধরে শোক প্রকাশ করে। এই ৭ দিন তারা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে—কোন মাছ, মাংস, ডিম খায় না। এ রকম ব্যবস্থা অন্যান্য উপজাতির মধ্যে দেখা যায় না। পুত্র-সন্তানেরা মাথা কামিয়ে মৃত আত্মার শান্তি ও মুক্তির জন্য নানারকম সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মানুষ্ঠান পালন করে থাকে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস : তারা নিজেদের তৈরি মদ, জাগারা, কানজী প্রভৃতি সুরা পান করে এবং হুঁকা ও পাইপ দিয়ে ধূম পান করে। তাদের আতিথেয়তা প্রবাদের মতো। তারা সহজ, সরল, সৎ এবং স্বভাবত অদূরদর্শী।

চাকমা সার্কেলের উপজাতি

চাকমা সার্কেলে নানারকম উপজাতি আছে, যেমন— চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, তনচাঙ্গিয়া, মুরং, বানজুগি, পাংখো, লুসাই প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে।

চাকমা

ইতিহাস ও শারীরিক গঠন-প্রকৃতি

এই উপজাতি ভারতীয় আর্যদের বংশধর। এরা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশি এবং উন্নত। তাদের আঞ্চলিক ভাষা হলো বিকৃত বর্মী ভাষায় লিখিত বিকৃত বাংলা। তাদের গায়ের রং সাধারণত ফর্সা হয়। তাদের শারীরিক গঠনে জলবায়ু ও মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে অন্তর্বিবাহের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে তাদের দৈহিক গঠনে কমবেশি মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আর্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। তারা উন্নত নাক, পেশল বাহু ও বলিষ্ঠ পায়ের অধিকারী। পাহাড়ে ওঠা-নামা এবং পাহাড়ের ঢালে অদ্ভুত ঝুম-চাষ পদ্ধতির অনুসরণই বোধহয় তাদের এই ধরনের দৈহিক গঠনের জন্য দায়ী।

জীবিকা : তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায় হলো লাঙ্গল ও ষাঁড়ের সাহায্য ছাড়াই পাহাড়ের চূড়ায় ও ঢালে অদ্ভুত ধরনের ঝুম চাষ। দা হলো এই চাষের প্রধান অস্ত্র। এই অস্ত্রের সাহায্যে জঙ্গল কেটে শুকানোর জন্য ১ মাসের মতো রৌদ্রে ফেলে রাখা হয়। তারপর এপ্রিলের প্রথম ১৫ দিনের ভিতর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে মাটির নিচ থেকে গাছের শিকড়-বাকড় তুলে ঝুমভূমি পরিষ্কার করা হয় এবং যখন বৃষ্টি শুরু হয় তখনই ধান, তুলা, কুমড়া, তরমুজ, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ এক সঙ্গে একটি ঝুড়িতে করে মিশ্রিত অবস্থায় দা দিয়ে জমিতে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে পুঁতে দেওয়া হয়। যথাসময়ে বীজগুলি গজিয়ে উঠে এবং যে সময়ের যে ফসল হওয়ার কথা সে সময়ে তা হয়। অবশ্য যখন সমতলভূমি পাওয়া যায় তখন পাহাড়িরা সমতলভূমির লোকদের মতো গরু-মহিষ দিয়ে লাঙ্গল চাষও করে থাকে।

দল ও গোজা : চাকমারা নানা দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রথমে চারটি প্রধান দল ছিল, যেমন—ধুর্জ, কুর্জ, ধাবানা এবং পিরাভাঙ্গা। এগুলির থেকে পরে নানা গোষ্ঠী বা গোজার উদ্ভব হয়েছে। এই সবের মধ্যে প্রধান হলো কুরা গুটা, ধামাই, ওয়াংজা লারমা, মুলিমা, বোরগোয়া, বগা প্রভৃতি। বিভিন্ন গোজা বা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিবাহে কোনো বাধা নাই।

গৃহ : তাদের বাড়িগুলি আগাগোড়াই বাঁশের তৈরি এবং বাঁশ বা কাঠের খুঁটি দিয়ে মাটি থেকে ৪/৬ ফুট উঁচু করে তৈরি। মেঝে ও দেয়াল বাঁশ চিরে করা হয়। ছাদ ছাওয়া হয় কুরুক পাতা দিয়ে। ঘরের নিচের খালি জায়গা ছাগল, শূকর, পশুপক্ষী রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। চায়ের সঙ্গে ছাড়া তাঁরা খুব কমই গরুর দুধ খেয়ে থাকে।

ধর্ম : তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

বিবাহ ও রীতি-নীতি : তাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ-প্রথা বিদ্যমান। বহুবিবাহ যদিও অনুমোদিত কিন্তু এর প্রচলন দিন দিন কমে আসছে। বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে। পুরুষেরা স্ত্রীর মধ্যে নিম্নলিখিত দোষক্রটি লক্ষ্য করলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে : (ক) ব্যভিচার, (খ) সংসারকর্মে অবহেলা, (গ) সংক্রামক ও দুরারোগ্য ব্যাধি।

অপরপক্ষে, স্ত্রী স্বামীর নিম্নলিখিত দোষ-ক্রটির কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে : (ক) নিষ্ঠুরতা, (খ) দুরারোগ্য ও সংক্রামক ব্যাধি, যেমন — কুষ্ঠ, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি, (গ) গৃহত্যাগ।

তাদের মধ্যে যৌতুকপ্রথা বিদ্যমান। বরের পিতা কনের পিতাকে যৌতুক দেয় তবে পরিস্থিতি অনুসারে অনেক সময় এর তারতম্যও লক্ষ্য করা যায়।

উৎসব : চাকমা সর্দারের চট্টগ্রাম জমিদারির অধীন 'রানা নগর রাঙ্গুনিয়া"য় ও মং সর্দারের চট্টগ্রাম জমিদারির অধীন "পাহাড়তলী রাজন"-এ বাংলা বৎসরের শেষে "মহামুণির" মেলা বসে। উৎসবে অনেক চাকমা ও মগ একত্রিত হয়। তাদের অপর বাৎসরিক উৎসব হল সর্দারের "পানাহা" বা "পুনাহা" উৎসব, তখন তারা শীতের ফসল তোলার পর আনন্দোৎসব ও পানভোজনোৎসবে মিলিত হয়। ভাল ফসল, সম্প্রদায়ের সার্বজনীন উন্নতি, অসুখ, মহামারী ও অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা পূজা-অর্চনাও করে থাকে।

উত্তরাধিকার : পুত্রেরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং তাদেরকে বিধবা মা ও অবিবাহিত বোনদের ভরণপোষণ করতে হয় (কেবল চাকমা সর্দারের পরিবারে আদি পুরুষ থেকে জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার লাভের বিধি চলে আসছে)।

গোপনে পলায়ন : সাধারণত বিয়ের ব্যাপারে মাতা-পিতার সম্মতির দরকার হয়। কিন্তু যদি কোনো যুবক তার প্রেমিকার সঙ্গে গোপনে পর পর ৪ বার পলায়ন করতে পারে, তবে সে (প্রেমিকা) বাবা-মার অমতেই বিয়ে করতে পারে, অবশ্য যদি তাদের সম্পর্ক নিষিদ্ধ কিছু না হয়। যা হোক প্রত্যেকবার পলাতক যুগলকে অপরাধের দণ্ড হিসাবে জরিমানা ও শূকর দিতে হয়।

পোশাক : পুরুষেরা ধুতি ও ঘরে বোনা কোট ও মাঝে মাঝে পাগড়া (খাবাং) পরে। স্ত্রীলোকেরা 'পিনধান', 'খাদি' ও মাঝে মাঝে 'খাবাং' ব্যবহার করে এবং কখনও কখনও

শাড়ী–ব্লাউজও পরে থাকে। 'পিনধান' হল ঘরে বোনা কালো রংয়ের স্কার্ট বা ঘাগরা যার উপরে ও নিচে লাল ডোরাকাটা এবং এক পাশে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সূচিকর্ম করা। এটা কোমর থেকে পায়ের গিট পর্যন্ত পেঁচিয়ে পরা হয়। খাদি বা বক্ষ–বন্ধনী সুন্দরভাবে বোনা নানা রংয়ের নক্‌শা করা $১\frac{১}{২}$ ফুট চওড়া ও $৪\frac{১}{২}$ ফুট লম্বা এক টুকরা কাপড় বক্ষদেশে জড়িয়ে পরা হয়।

সঙ্গীত : তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো বাঁশের বাঁশী। সাধারণত যুবকেরা এতে বিলাপের সুরে প্রেমের গান বাজায়। এইসব গান তাদের কাছে খুব প্রিয় এবং মনমুগ্ধকর। বাড়ির স্ত্রীরা ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য একটানা সুরে কাঁপা কাঁপা গলায় সহজ সরল ঘুমপাড়ানী গান গায়। এইসব চাকমা গানের কিছু কিছু গৈরিকা পুস্তকের ৭৯, ৮০ ও ৮১ পৃষ্ঠায় আছে (রাণী বিনীতা রায় কর্তৃক চাকমা গানের আক্ষরিক অনুবাদ)।

তাদের প্রধান মহাকাব্য "রাধামোহন ও ধনপতি" প্রেমিক যুগলকে নিয়ে লিখিত। এটা কতকটা শেকস্‌পিয়ারের রোমিও–জুলিয়েট এবং হোমারের ইউলিসিস–এর মতো। এছাড়া, পল্লিবালা 'তানাবীকে নিয়ে রচিত প্রেমের কবিতাও উল্লেখযোগ্য। তানাবীর অপরূপ সৌন্দর্য প্রবাদের মতো, যা অনেক বিরহীর মনে দোলা জাগায়। আজকাল গ্রামের অনেক উদ্যোগী যুবক যাত্রাদল গঠন করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করছে।

বস্ত্রবয়ন : বয়নকর্ম চাকমা মেয়েদের জন্য একটি অপরিহার্য বিশিষ্ট গুণ। তাদের ব্যাপক নক্‌শা সংবলিত কাপড় 'আলম' নামে পরিচিত। এই নক্‌শা প্রাচীন মিশরের কারুকার্যময় বস্ত্রাদির মতো। উপজাতিরা প্রায়ই দেশীয় পদ্ধতিতে সূতা রং করে থাকে। নীল বা কালো রং তৈরির জন্য 'কালমা' বা নীল গাছের পাতা মাটির পাত্রে রাখে এবং এই পাত্র পানি ভর্তি করে দুই দিন এই পাতা ভিজিয়ে রাখে। কালো রং–এর জন্য 'কালা গাব' গাছের ছাল পানি দিয়ে সিদ্ধ করে। লাল রং একটা গাছের শিকড় থেকে পায়। এই গাছকে পাহাড়িরা রং গাছ বলে। হলুদ এবং সবুজ রং ও এরা তৈরি করে। হলুদ ও আমগাছের ছাল মিশিয়ে হলুদ রং, নীল ও হলুদ মিশিয়ে সুন্দর সবুজ রং তৈরি করে। বিভিন্ন প্রকার রং তৈরি করার জন্য তারা ঠিক নীল রং তৈরি করার পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকে।

সূতাকাটা : চরকা দিয়ে সূতা কাটার প্রচলন কোন কোন অংশে বিদ্যমান।

সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও অভ্যাসাদি : তারা প্রকাশ্যভাবেই নিজেদের তৈরি মদ খায় এবং হুঁকায় ও পাইপে ধূম পান করে। তাদের আতিথেয়তার জনশ্রুতি আছে। যদিও অন্যের জন্য নিচু কাজ করা তাদের স্বাধীন বিবেকে বাধে তবুও নিজেদের স্বার্থে কঠোর পরিশ্রম করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। তারা সৎ, সত্যবাদী ও সরল কিন্তু স্বভাবত তারা অদূরদর্শী।

শবদাহ : চাকমারা মৃতদেহ দাহ করে এবং সপ্তাহকাল ধরে শোক প্রকাশ করে। এই সময় তারা মাছ–মাংস খায় না। এটা শুধু চাকমাদের মধ্যেই দেখা যায়। অন্যান্য উপজাতির

মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হয় না। সপ্তাহ শেষে শ্রাদ্ধের দিনে পুত্রদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হয়। তারা সাধ্যমত সবরকম দান-খয়রাত করে। তারা পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ভোজ দানের মাধ্যমে ধর্মের ও সমাজের আইন-কানুন পালন করে থাকে। এ সমস্তই তারা বিদেহী আত্মার মঙ্গল ও মুক্তিলাভের জন্য করে থাকে।

মগ উপজাতি

সংখ্যায় এবং কৃষ্টির দিক থেকে পার্বত্য অঞ্চলে এবং চাকমা সার্কেলে তারা দ্বিতীয়। এই উপজাতি তিব্বতীয়-বর্মী পরিবারের বর্মী দলের একটি শাখা। তাদের ভাষা হলো "মাঘী"। এটা বর্মীয়দের বর্মীয় হরফে লেখা বিকৃত আঞ্চলিক আরাকানী ভাষা।

কয়েক শতাব্দী ধরে চাকমাদের সঙ্গে বাস করে তারা তাদের জাতীয় পোশাক লুঙ্গী পরিত্যাগ করে ধুতি পরছে। পুরুষেরা বাড়িতে বোনা কোট এবং 'ঘাংবং' নামে পরিচিত সাদা পাগড়ি জাতীয় মাথার পোশাক পরিধান করে। মেয়েরা "থানি" নামে কথিত রঙ্গীন স্কার্ট এবং বাড়িতে তৈরি বক্ষ-বন্ধনী "রাংগাই" ও গহনা পরিধান করে।

ধর্ম ও রীতি-নীতি : তারা বৌদ্ধ এবং প্রত্যেক বড় গ্রামে মন্দির তৈরি করতে আগ্রহী। তারা অন্যান্য উপজাতির মতই বিয়ের ব্যাপারে গোত্র ঘেঁষা এবং তাদের ভিতর কদাচিৎ গোত্রের বাইরে বিয়ে হয়। উত্তরাধিকার-প্রাপ্তি, গোপনে পলায়ন, বিয়ে ও বসবাসের পদ্ধতিতে চাকমাদের সঙ্গে তাদের খুব কমই পার্থক্য আছে। কিছুটা পার্থক্য এই যে ঘোরাফেরার ব্যাপারে চাকমা মেয়েদের থেকে এদের স্বাধীনতা কিছুটা বেশি এবং এদের তালাকের আইনও কিছুটা শিথিল। আর একটা উদাহরণ এই যে কারও মৃত্যুর পর পরিবার-পরিজনদের মাছ-মাংস পরিত্যাগ করতে হয় না এবং পুত্রদের মস্তক মুণ্ডনও করতে হয় না।

মগদের বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে, যেমন—পালাংসা, রিগ্রেটসা, কোকোদাসা, চিরিংসা ইত্যাদি। অপর আর একটি পার্থক্য এদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দেখা যায়, যেমন—চাকমা পুরুষ ও মেয়েরা অতিথিপরায়ন এবং কঠোর পরিশ্রমী ; কিন্তু মগ পুরুষেরা সাধারণত অলস ও আরামপ্রিয় এবং এমনকি কমবেশি ঘরের কাজ ও মাঠের কাজেও স্ত্রীদের উপর নির্ভরশীল। তাদের কাপড় বোনানীও সাদাসিদে, চাকমাদের মতো সূক্ষ্ম বা রঙ্গীন বোনানী নয়। মগেরা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী হুঁক্কায় ধূমপান না করে চুরুটে ধূমপান করে। কেউ কেউ আফিম খেয়ে নেশা করে। তারা অত্যন্ত ধর্মপরায়ন এবং পিপাসার্ত পথচারীদের জন্য পথের পাশে পানির পাত্র রেখে দেওয়ার রীতি চাকমাদের থেকে বেশি মেনে চলে।

ত্রিপুরা উপজাতি

সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় উপজাতি হলো ত্রিপুরারা। এদের পূর্ব পুরুষদের আবাসভূমি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে। সেখান থেকে তারা দেশ ত্যাগ করে এসেছে। তারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় এবং কমবেশি হিন্দু ধর্মের আইন মেনে চলে ; কিন্তু সামাজিক দিক থেকে তারা অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে। তারা পাহাড়ি রীতি–নীতি মেনে চলে এবং তাদের জীবনযাপন ও বসবাস পদ্ধতি একই রকমের। যাহোক, বিয়ের ব্যাপারে চাকমা ও মগদের মত মাতা–পিতার মতামত এত প্রয়োজন হয় না, যদি না সংশ্লিষ্ট ছেলে ও মেয়ের বিয়ে নিষেধের কিছু হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা এই যে—মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুত্র থাকে তবে কন্যাসন্তান থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হয় এবং স্ত্রী মারা গেলে কন্যা উত্তরাধিকারিণী হয়।

এই উপজাতির মধ্যে ৩৬ রকমের গোষ্ঠী আছে যেমন—ফাতোং, খালি, নাইতং, আনো, গোরপাই, রিয়াং, বংবাছেছ ইত্যাদি। ফাতোং, খালি ও অন্য কোনো গোষ্ঠীর মতে তালাক হলে নাবালক পুত্র পিতার হয় এবং নাবালক কন্যা মায়ের হয়। নাইতং, আনো ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মতে নাবালক ছেলেমেয়েরা পিতার হয়, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মা নিয়ে যায় এবং দুধ ছাড়লে পিতাকে ফিরিয়ে দেয়। পুরুষেরা সাধারণত ধুতি, কোরতা ও মাথার পোশাক (যাকে তারা পাগড়ি বলে) পরিধান করে। মেয়েরা বাড়িতে বোনা স্কার্ট (যাকে তারা 'রেনাই" বলে), খাদি, ব্লাউজ এবং মাথার পোশাক (যাকে তারা 'খারোকচা' বলে) পরিধান করে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মেয়েরা বিভিন্ন রকমের কাজ করা রেনাই পরিধান করে।

তনচাঙ্গিয়া উপজাতি

তনচাঙ্গিয়া চাকমা উপজাতির একটি শাখা-উপজাতি। তারা সাধারণত নদীর পাড় থেকে দূরে পাহাড়ে বাস করে। "তন" শব্দের অর্থ পাহাড়ের চূড়া। তনচাঙ্গিয়া শব্দ দ্বারা পাহাড়ের চূড়ায় বসবাসকারী চাকমাদের বুঝায়। তাদের আঞ্চলিক ভাষা চাকমা থেকে কিছুটা আলাদা—কিন্তু মেয়েদের পোশাক–পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ পৃথক। মেয়েদের স্কার্ট কালোর উপর লাল, সবুজ, হলুদ ও অন্যান্য রং–এর সূতা দিয়ে বোনা ডোরা থাকে এবং এটা চাকমা পরিধেয় স্কার্টের কিনারের 'চাবুকী' নক্‌শা ছাড়াই তৈরি করা হয়। পুরুষেরা সাদা মস্তকাবরণ এবং মেয়েরা পাশে রঙ্গীন কাজকরা সাদা মস্তকাবরণ পরিধান করে। বক্ষ আবরণের কাপড় লাল অথবা কালো হয় কিন্তু চাকমা "খাদির" মত এতো কারুকার্যময় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। অবিবাহিত পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশায় কোনো বাধা নাই। কেবল সন্তান–সম্ভবা মেয়েরা মেলামেশা করলে সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাদেরকে জরিমানা ও শূকর দিতে হয়। একমাত্র এই উপজাতির মধ্যেই বরের বয়স স্ত্রীর

বয়সের থেকে কম। সাধারণত বরের বয়স ১৪/১৫ বৎসর বা তারও কম এবং স্ত্রীর বয়স ১৭/১৮ বৎসরের উপর হয়। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমা এবং শাখা উপজাতি তনচাঙ্গিয়াদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে এমন জানা যায় না। সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতি-নীতিতে অন্য বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। তারা ৬টি শ্রেণী বা 'গোজাতে' বিভক্ত, যথা—ধানিয়া, কাবা, মুত্ত, মোঙ্গলা, লামবাছা এবং মেলঙ্গছা।

মুরং উপজাতি

মুরং উপজাতি তিব্বতীয় বর্মী পরিবারের বংশধর। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, কিন্তু লিখিত কোনো অক্ষরমালা নাই। ধর্মে তারা বৌদ্ধ। তারা জ্যেষ্ঠত্বের আইন অনুসরণ করে। জ্যেষ্ঠপুত্র একাই উত্তরাধিকারী হয়। তারা বেশি বয়সে বিয়ে করে এবং বাড়িতে এক বৎসরে একটাই বিয়ে হতে পারে। বিয়েতে নির্দিষ্ট ১০০.০০ টাকা যৌতুক দিতে হয়। তাছাড়া, যে-কোন গহনার মূল্য, থালা-বাসন, গৃহপালিত পশু, কনের বাবা কনেকে উপহার দেয় এবং এসবই বরের বাবাকে দিতে হয়। নগদ যদি না দিতে পারে অথবা তার জীবদ্দশাতে পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তার উত্তরাধিকারী এ ঋণ পরিশোধ করবে। এ ঋণ পরিশোধ করাকে নৈতিক বাধ্যবাধকতা মনে করা হয়। যদি বর নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাহলে কনে তার গহনাপত্র ও নিজের অন্যান্য জিনিসপত্রসহ বাবার বাড়িতে চলে আসে। কনের বাবাকে তখন যৌতুকের টাকা এবং অন্যান্য জিনিসের মূল্য বরের বাবাকে ফেরৎ দিতে হয়। যদি স্বামী কোন সন্তান রেখে যায় তবে স্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে তার বাবার বাড়ি চলে আসতে পারে।

গোপনে পালানোর শাস্তি সমাজের পদমর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট করা আছে, যেমন—মাতবরের মেয়ের বিয়ে অন্য স্থানে ঠিক হওয়ার পর যদি সে অন্য লোকের সঙ্গে পালিয়ে যায় তাহলে পলাতক যুগলকে ৭০.০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। জরিমানার দুই-তৃতীয়াংশ ছেলেকে এবং এক-তৃতীয়াংশ মেয়েকে বহন করতে হয়।

এ ছাড়া পলাতক যুগলকে ১৫.০০ টাকা মূল্যের তিন হাত পরিমাণ একটা শূকর গ্রামের লোকদের খাওয়ার জন্য দিতে হয়। একই রকম অবস্থায় কারবারির বাগদত্তা মেয়ের পলায়নে, পলাতক যুগলকে ৬০.০০ টাকা জরিমানা ও একটা শূকর দিতে হয়। একজন সাধারণ গ্রামবাসীর বাগদত্তা মেয়ের পলায়নের জন্য পলাতক যুগলকে ৩০.০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। বাগদত্তা নয় এমন মেয়ের পলায়নের জন্য এমন কোন শাস্তি নাই—তবে অবশ্যই তাদের বিয়ে করতে হবে এবং গ্রামের লোককে শূকরের জন্য ৫.০০ টাকা দিতে হয় (অবশ্য যদি পলাতক যুগলের বিবাহ নিষিদ্ধ কিছু না হয়)। বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার বা বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেলে ৬০.০০ টাকা জরিমানা এবং ৩টি শূকর দিতে হয়। যে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের মধ্যে যদি ব্যভিচার প্রমাণিত হয় তাহলে ছেলেকে একটি খালি মুরগীর বাক্স মাথায় করে তাতে ৩টি

শূকরের গোস্ত নিয়ে গ্রামের প্রত্যেকের বাড়িতে বিলি করতে হবে এবং প্রত্যেক বাড়িতে তার অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে—তা বলতে হবে। এরপর অপরাধী যুগলকে পুরোহিতের কাছে উপদেশ নিতে হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে চন্দনের পানিতে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। তারপর তারা যার যার বাড়িতে ফিরে আসে এবং সমাজে গৃহীত হয়।

তারা শবদাহ করে। কিন্তু যারা কলেরায়, আমাশয় এবং যেসব শিশু দাঁত উঠার পূর্বেই মারা যায় তাদেরকে কবর দেওয়া হয়।

পূজা : "কেরাই" পূজা বৎসরে দুইবার—ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসে গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩ দিন ধরে চলে। এই সময় বাইরের কাউকেই গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যদি গ্রামে কোন রোগ দেখা দেয় তখন তারা 'বসুমতী" পূজা করে ও তাতে একটা ষাঁড় বা গাভী বলি দেয়। তারা সারারাত নাচে, গান গায় এবং রুগীর রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। তারপর ভোরে রোগ আরগ্যের জন্য ষাঁড়কে বলি দেয়।

পোশাক : পুরুষেরা ধুতি কিনে, কিন্তু নিজেদের কোর্তা বোনায় এবং "খাবাং" নামে পরিচিত মস্তকাবরণ পরিধান করে। মেয়েরা কালো পরিধান (স্কার্ট) পরে। নিজেদের বোনা ব্লাউজ গায়ে দেয়। তারা বুকের কাপড় পরে না। 'পিনধান' মাত্র হাঁটু পর্যন্ত আসে এবং বাঁ পাশে খোলা থাকে ; এর মাঝখানে আগাগোড়া ৬ ইঞ্চি কাজ করা থাকে। পুরুষ ও মেয়েরা লম্বা চুল রাখে। মেয়েরা মাথার পিছনে চুল বেঁধে রাখে এবং পুরুষেরা মাথার বাম পাশে বাঁধে।

নাচ : নাচ তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাদ্যযন্ত্র হলো বাঁশের বাঁশী যা দেখতে কতকটা থলিযুক্ত বাঁশি এবং কিছুটা বড় ঘন্টার মতো। পুরুষেরা যখন নাচে তখন লাল ধুতি পরে ও মাথায় পালক ও পুঁতিযুক্ত মস্তকাবরণ পরিধান করে। মেয়েরা ফুল, পুঁতি ও মুদ্রা দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করে।

পাংখো উপজাতি

পাংখোরা তিব্বতীয় বর্মী পরিবারের বংশধর। তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা আছে—কিন্তু লিখিত কোনো অক্ষরমালা নাই। পুরুষেরা মাথার পিছনে চুল বাঁধে এবং কপালের দিকে খানিকটা অংশও কামিয়ে রাখে। তারা বাড়িতে বোনান কোর্তা পরিধান করে। কোট ও স্কার্ট বাজার থেকে কিনে নেয়। তাদের মাথার পোশাক "খাবাং" বাড়িতে তৈরি এবং মাত্র উৎসবের দিনে ব্যবহার করে। রোমান আলখিল্লার মতো তারা এক রকম পোশাক "চোং-নাক-পুন" (পাচারা) পরে। এতে কালো কাপড়ের উপর বহু রংয়ের ডোরা আছে এবং দেখতে বেশ চমৎকার।

মেয়েরা যে স্কার্ট বা ঘাগরা পরে তার নাম 'খাজেল'। এটা ছেলেদের পোশাক অপেক্ষ্য বেশি নক্‌শা করা। স্কার্ট কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে। তারা বুকে

কাপড় পরে এবং সেটা বাজার থেকে কিনে আনে—এটা তারা বুনাতে পারে না। প্রাচীনকালে পরিবারের সব সদস্য এক কামরাওয়ালা ঘরে বাস করতো। তারা হাতে বোনান ঢাকনা 'পিওয়ানসিল' গায়ে দিয়ে একসঙ্গে ঘুমাতো। আজকাল তারা ঘরের মাঝে বেড়া দিয়েছে এবং সময় সময় ভিন্ন ঘরে ঘুমায়।

ধর্ম : তারা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু শিবপূজাও করে। নদীপূজার সময় তারা শূকর ও ছাগল বলি দেয়। শিবপূজার সময় শূকর, মহিষ বা বন্য ষাঁড় বলি দেয়।

রীতি-নীতি : তারা নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করে এবং সাধারণত মাতা-পিতা এতে মত দেয়। নির্দিষ্ট ২৫০.০০ টাকা নগদ বা ঐ টাকার দ্রব্য বরের পিতাকে এককালীন বা কয়েক দফায় দিতে হয়। এই টাকা যদি সে সারা জীবন দিতে না পারে তবে তার বংশধরকে তা পরিশোধ করতে হয়। তারা বড় একটা কাঠের থালাতে এক সঙ্গে খায়। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি, জামাই বা পুত্রবধূর সঙ্গে খায় না।

বিবাহ-বিচ্ছেদ : বিবাহ-বিচ্ছেদ শুধু তখনই হতে পারে যখন স্বামী স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে বা স্ত্রী ব্যভিচারী হয়। ছেলেমেয়ে বাবার সঙ্গে থাকে। বিধবারা পুনর্বিবাহ করতে পারে, কিন্তু প্রথম পক্ষের সন্তানদের সঙ্গে নিতে পারে না। এইসব সন্তান দাদা-দাদীর সঙ্গে থাকে।

উত্তরাধিকার : কনিষ্ঠ ছেলে বাবার সব সম্পত্তির বা বৃহৎ অংশের অধিকারী হয়। সে তার বিধবা মা ও অবিবাহিতা বোনদের ভরণপোষণ করে।

শবদাহ : তারা মৃতদেহ কবর দেয়। মরার পর ও কবরস্থ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মীয়রা উপবাস করে। কেবল মাত্র "বেনগুজি" উপজাতির সঙ্গেই বিয়ে হতে পারে।

নাচ ও গান : তাদের নিজস্ব সঙ্গীত ঘণ্টা এবং ঢোল আছে। নাচের সময় পুরুষেরা মাথায় পালক পরে এবং পুঁতি ও হলদে পাথরের মালা গলায় পরে। মেয়েরা নক্‌শা করা পিতলের কোমর-বন্ধন পরে। রঙ্গীন পতঙ্গের পালকের তৈরি ঝুনঝুনি গহনা পরে। পীতাভ তৈলস্ফটিক তাদের অন্যতম সংরক্ষিত বস্তু যা বংশপরম্পরায় হস্তান্তর করা হয়ে থাকে। বন্য মহিষ বা ষাঁড় সাধারণত ধনীদের সম্পত্তি। লোকেরা সাধারণত মিতব্যয়ী ও টাকা মজুত রাখে।

বানজুগি উপজাতি

রীতিনীতি, অভ্যাস ও ধর্মীয় দিক থেকে তারা "পাংখো" উপজাতির মতো। তাদের কথ্য ভাষায় যে পার্থক্য তা উপেক্ষা করা চলে। তাদের মধ্যে দুইটি মাত্র পার্থক্য আছে—পুরুষেরা মাথার চুল সামনে বাঁধে এবং সামনের চুল কামায় না। অপর পার্থক্য হলো আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর পর তারা উপবাস করে না। এরা এবং পাংখোরা সাধারণত কুকি

বলে পরিচিত কিন্তু এখন তারা এই কথার প্রতিবাদ করে। এই দুই উপজাতির মধ্যেই কেবল বিয়ের রীতি আছে, অন্য কোনো উপজাতির সঙ্গে এদের বিয়ে হয় না।

লুসাই উপজাতি

চাকমা সার্কেলে অল্পসংখ্যক লুসাই উপজাতি আছে। তারা তাদের মাতৃভূমি লুসাই পাহাড় ছেড়ে চলে এসেছে। তাদেরকে 'পাংখো' ও 'বানজুগি' উপজাতির থেকে বেশি সভ্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রায় সবাই সর্বপ্রাণবাদী। তাদের টোগা (গাত্রবস্ত্র) সাদার উপর বিভিন্ন রংয়ের ডোরা দিয়ে তৈরি করা। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে কিন্তু লিখিত কোন বর্ণমালা নাই।

রীতি-নীতি : তাদের রীতি-নীতি কিছুটা বানজুগি ও পাংখোদের মত। তাদের মধ্যে কিছু লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তারা তাদের জাতীয় পোশাকের পরিবর্তে খাট কাপড় ও সার্ট পরিধান করে। তাদের পাহাড়ি কুকুরের মত কুকুর খুব কম আছে, এগুলি শক্ত-সামর্থ্য ও বক্র লেজবিশিষ্ট। এগুলি সাধারণত গাঢ় কালো বা বাদামী বর্ণের হয়। এগুলি কিছুটা চীনের 'চৌ' কুকুরের মত। অন্যান্য পাহাড়িয়া উপজাতির মত তারাও বাড়ির তৈরি মদ ও কুকুর পছন্দ করে।

পাংখো ও বানজুগি উপজাতির মত তাদেরও বৈশিষ্ট্য হ'ল—তারা ঝুমভূমি ঘিরে রাখে এবং ফাঁদ পেতে রাখে যাতে এমন কি ছোট ছোট জন্তুগুলিও ধরা পড়ে এবং ঝুমভূমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট না করতে পারে।

চাকমা-রাজ ১.৮.১৯৫১

চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাস

অনেক দিন পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে ‘শাক্য’ নামে এক রাজা বাস করতেন, কালাপানগর তার রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেখানে তিনি ঈশ্বরের মূর্তি তৈরি করে তার আরাধনাতেই নিজেকে মগ্ন রাখতেন। সানকুশি ‘মন্ত্রীর’ জন্মও এই পরিবারে—তিনি দুষ্টের দমন করে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করতেন। ‘সুধন্য’ নামে শাক্য রাজার এক সাহসী পুত্র ছিল। তিনি ক্ষত্রীয় বীরদের মত শত্রুদের দমন করতেন। রাজা সুধন্য সেনাপতি জয়ধনকে সঙ্গে করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। রাজা সুধন্যের দুই রাণী ও তিন পুত্র ছিল। প্রথম রাণীর পুত্র ‘গুণাধন’ রাজকীয় আনন্দ পরিত্যাগ করে মোহমুক্তির জন্য কঠোর তপস্বীর জীবন যাপন করতেন। কনিষ্ঠ রাণীর ‘আনন্দ-মোহন’ ও ‘লাঙ্গলধন’ নামে দুই পুত্র ছিল। আনন্দমোহন সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হলুদ পৈতা পরিধান করলেন।

দ্বিতীয় পুত্র ‘লাঙ্গলধন’ রাজা হয়ে প্রজাদের শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

লাঙ্গলধনের পুত্র ‘সুদ্রজিৎ’ কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করলেন। সেনাপতি জয়ধনের পুত্র ‘সুবল’ এবং সুবলের পুত্র ‘শ্যামল’ পর পর তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। সুদ্রজিতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ‘সমুদ্রজিত’ রাজা হলেন। মন্ত্রী শ্যামল-এর সাহায্যে তিনি কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করলেন।

২০ বৎসর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়ে রঙ্গীন পৈতা পরে বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটলো। মন্ত্রী শ্যামল কালাপানগর পরিত্যাগ করে হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব ধারে একটা নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন। তার নতুন রাজধানী নানা রকমের ফুলের বাগান, পুকুর ও মন্দির দিয়ে সাজান হ'ল।

চম্পাকলি নামে তার এক পুত্র ছিল। ইরাবতী নদীর পূর্বপারে তিনি একটা নতুন নগর গড়ে তুললেন এবং তাঁর নাম অনুসারে এর নাম রাখা হ'ল চম্পকনগর। তিনি ইরাবতী নদীর উপরে একটা মন্দির নির্মাণ করে ঈশ্বরের মূর্তি স্থাপন করলেন। চম্পাকলির পুত্র সাধনগিরি খুব ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে নিজেকে নিমগ্ন রাখতেন এবং সাধনার উচ্চতম স্তরে পৌছেছিলেন। তিনি পুরাপুরি যোগসাধনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্মযোগের সাহায্যে স্বর্গীয় জ্ঞানের আগুনে তিনি অজ্ঞানতার আঁধার এই পাপপূর্ণ দেহ পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে মোহমুক্তি লাভ করেছিলেন।

তাঁর পুত্র চেঙ্গিয়াসুর রাজা হলেন এবং ইটের মন্দির তৈরি করে ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেশের লোক এবং রাজা একই গোত্রের তাই তারা রাজার প্রতিষ্ঠিত মূর্তি পূজা করতে লাগলো। চেঙ্গিয়াসুরের দুই পুত্র ছিল — ধর্মসুর ও চান্দাসুর। চেঙ্গিয়াসুর খুব ধার্মিক ছিলেন এবং অনেক ভাল কাজ করে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন ছেড়ে রঙ্গীন পৈতা পরে ধার্মিক জীবন যাপন করতে লাগলেন—আর দ্বিতীয় পুত্র চান্দাসুর রাজা হয়ে দুষ্টের দমন করে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। মহারাজ চান্দাসুরের তিন পুত্র ছিল — সুমেসুর, দেবাসুর ও বিম্বাসুর।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুমেসুর রাজা হলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন ভিমাঞ্জয়।

ভিমাঞ্জয় বড় বীর ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি শিকারে বের হয়ে একা একা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতেন। সিংহ, গণ্ডার, মহিষ ও বাইসন ধরা তার শিকার ছিল। একদিন কিছু সৈন্য নিয়ে শিকার করতে করতে হিমালয় পর্বতের পূর্ব ঢালে অবস্থিত গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। হরিণ শিকারের আগ্রহে ঘুরতে ঘুরতে একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। এর উপর একটি সোনার মন্দির দেখতে পেয়ে মহারাজ তাঁর সৈন্যদের বললেন, "চলো আমরা এই মন্দিরের দরজা খুলি এবং দেখি কার মূর্তি এর মধ্যে স্থাপন করা আছে।" দরজা খোলার পর দেখতে পেলেন সেখানে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা আছে। এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের মত ও মূর্তির সামনে একখণ্ড পাথরের উপর বুদ্ধের কিছু বাণী ক্ষোদিত আছে। রাজা সেইসব ধর্মানুশাসন নকল করে নিলেন এবং এই মূল্যবান বাণী নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। "সম্বুদ্ধ" রাজা ভিমাঞ্জয়ের পুত্র ছিল।

রাজা সম্বুদ্ধের বিজয়গিরি ও উদয়গিরি নামে দুই পুত্র ছিল। বিজয়গিরি চম্পকনগর পরিত্যাগ করে নদীপথে ছয় দিন ও ছয় রাত্রি চলার পর কোন এক স্থানে এসে নামলেন। তার সঙ্গে চারজন পণ্ডিত ও ৭ "চামুস" (প্রায় ২৬ হাজার) সৈন্য ছিল। বিজয়গিরি নিজের জন্য কয়েক দল সৈন্য নিয়ে "তেওয়া" নদীর উপর "কালাবাঘা" নামক স্থানে থেকে গেলেন। অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে দিয়ে সেনাপতিকে সম্মুখ-যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। এর পর আমরা বিজয়গিরির আর কোন সংবাদ জানি না। তাঁর সেনাপতি "ইনডাং" বা "ক্রিনডাং" পাহাড়ে ও "টেকনাফে" যুদ্ধ করেছিলেন। অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে সেনাপতি যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিজয়গিরিকে সংবাদ দিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে বিজয়গিরি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করলেন এবং বিজিত রাজ্য শাসন করার ব্যবস্থা করলেন। এরপর সেনাপতি তার জন্মভূমিতে ফিরে গেল এবং পরবর্তীকালে বিজয়গিরিও দেশে ফিরেছিলেন, কিন্তু কালাবাঘা অঞ্চলে পৌঁছেই শুনতে পেলেন যে তার পিতা মারা গেছেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়গিরি অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করে বসেছেন। এই সংবাদ পেয়ে তিনি নিজের দেশে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার বিজিত রাজ্যে ফিরে এলেন। সেখানে তিনি একজন "আড়ি" মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

সেখানে রাজা বিজয়গিরির কোন বংশধর ছিল না। বার্মার ইতিহাস "চুইজাং কায়াথা"-তে বর্ণিত আছে যে, বার্মা সাম্রাজ্য তিনটি দেশে বিভক্ত ছিল এবং তার একটি চাকমা রাজার অধীন ছিল।

যেসব চাকমাদের সম্মুখ-যুদ্ধে পাঠান হয়েছিল শ্বেতহস্তী তাদের একজনকে মাথায় করে তুলে নিয়ে এলো এবং তাকেই রাজ-সিংহাসনে বসান হ'ল। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁর মেয়ের নাম ছিল "মানিকবি"। তাঁর স্বামী বাঙ্গালীদের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি মগদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছেন এইজন্য তাঁকে বলা হত "বাঙ্গালী সর্দার"। এইসব যুদ্ধ ১১১৮ ও ১১১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রোয়াং (আরাকান)-এ হয়েছিল। (আরাকানের ইতিহাস ডেঙ্গিয়া ওয়াদি আড়াডাফাং-এর ১৭ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মানিকবির পুত্র "মানিকগিরি" মানিক (মুক্তা) পেয়ে রাজা হলেন। তাঁর পুত্র "মাদালিয়া" তারপর রাজা হলেন। তারপর "মাদালিয়ার" পুত্র "রামাথংজা" রাজা হলেন। রামাথংজার পুত্র "কামালচেগা"—তাঁর রাজত্বের সময়েই রোয়াং-এ যুদ্ধ হয়েছিল এবং চাকমারা সেই সময় সেই দেশে দেশান্তরিত হয়ে যায়।

কামালচেগার পুত্র রতনগিরি তারপর সিংহাসনে বসেন। তাঁর পুত্র "কালাথংজা" তারপর রাজা হন। তারপর তাঁর পুত্র "সেরমাটিয়া" রাজা হন। তাঁর রাজত্বের সময় নামকরা সেনাপতি "রাধা মোহনের" নেতৃত্বে চাকমারা রোয়াং-এ যুদ্ধ করেন। এই সময়ই চাটিগাঁর ছড়া (চট্টগ্রামের গান) কবিতা রচিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "আরানযুক" রাজা হন। মগদের সঙ্গে তাঁর বহুবার যুদ্ধ হয়েছিল। আরানযুকের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। আরাকানের ইতিহাসে (ডেঙ্গিয়া ওয়াদি আরাফাং) বর্ণিত আছে যে, ১৩৩৩-১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বার্মার রাজা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বিজ্ঞোচিত মনে না করে বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছায় তাঁর উজিরকে চাকমারাজ আরানযুকের নিকট পাঠালেন। দূত গিয়ে জানালেন যে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁকে পাঠান হয়েছে এবং বর্মার রাজা চাকমা রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য একজন মেয়ে সঙ্গে পাঠিয়েছেন। আরানযুক যখন সেই মেয়েকে নিয়ে রাজধানী "মাইচাগিরিতে" আনন্দ করছিলেন (মেয়েটিকে বর্মা রাজার বোন বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল), হঠাৎ রাত ১২টার সময় তিনি উজির কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বন্দী হন। তাঁর ছেলেমেয়েদেরকেও বন্দী করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ছেলেকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তৃতীয় ছেলেকে সামুদ্রিক বণিকদের নিকট হতে আবগারী শুল্কের "আদায়কারী" নিযুক্ত করা হয়। সেইজন্য তাকে ঘাটিয়া বা "ঘাওটিয়া রাজা" (খাজনা আদায়কারী রাজা) বলা হতো। মগ রাজা জ্যেষ্ঠ রাজকুমারী "সোনাবিকে" বিয়ে করলেন ও কনিষ্ঠকে পারিষদের একজনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। বসবাস করার জন্য দুই রাজকুমারীকে দুইটি দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের নাম অনুসারে দেশ দুইটির নাম হলো "সোনাপুর" ও "মানিকপুর"। ঘাটিয়া রাজার নাম ছিল "চান্দুথংজা"। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "মাইছং" রাজা হলেন। এই মাইছংই কর দিতে না পেরে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে গেলেন।

সেইজন্যই তাঁকে মাইছং (বৌদ্ধ ভিক্ষু) রাজা বলা হতো। তাঁর সময়েই চাকমাদের উপর মগেরা খুব অত্যাচার করতো, এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা গোপনে ঠিক করলো এই দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। এই রাজা সম্বন্ধে একটা শ্লোক আছে যার অর্থ এইরূপ —"মাইছং রাজা আমাদর সঙ্গে আসলেও আমাদের কোন আনন্দের কারণ নাই এবং না আসলেও কোন দুঃখ নাই।"

মাইছং রাজার পুত্রের নাম ছিল "মারিকিয়া"। মারিকিয়ার রাজত্বকালেই চাকমারা রোয়াং ছেড়ে এসে কদমতলীতে বসবাস করতে থাকে। এই জন্যই "মারিকিয়ার" পুত্রকে এই স্থানের নাম অনুসারে কদমথংজা বলে ডাকা হতো।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "রদংছা" রাজা হলেন। তারপর তাঁর পুত্র "তিন সুরেশ্বরী" রাজা হলেন। "জানু" তিন সুরেশ্বরীর পুত্র ছিলেন। তাঁর সেনাপতি রণ-পাগলা (যুদ্ধ পাগলা) মগদের সঙ্গে "তেইনচারাতে" বহুবার যুদ্ধ করেছেন। জানু রাজার এক মেয়ের স্বামীর নাম ছিল "বুড়া (বৃদ্ধ) বড়ুয়া"। জানু ১২০ বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তাঁর প্রথম মেয়ে "সাজেমবি"র মগ রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মেয়ে "রাজেমবি"র বুড়া বড়ুয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল।

বুড়া বড়ুয়ার ছেলে "সাথুয়া" রাজা হলেন। তিনি পাগলা রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন এবং যোগ সাধনা অবলম্বন করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তার হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীভুঁড়ি মন্ত্রবলে টেনে বের করে ধুয়ে আবার সেগুলিকে যথাস্থানে রেখে দিতে পারতেন। কোন এক সময়ে তিনি যখন তার হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীভুঁড়ি বের করে ধুচ্ছিলেন তখন রাণী উঁকি মেরে দেখেছিলেন — যার ফলে তিনি আর তাঁর হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীভুঁড়ি যথাস্থানে রাখতে পারলেন না। এবং ফলে তিনি সত্যিকারের পাগল হয়ে গেলেন। তারপর রাণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মানুষ মারতে শুরু করলেন। একটা প্রবাদ আছে যে কোন এক সময়ে পাগল রাজা বাইরের ঘরে বসে আছেন, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একটা লোক বন্য হাতী এসেছে বলে চীৎকার করতে থাকে, রাজা হাতিটি দেখার জন্য গলা বাড়ালে একজন লোক পিছন দিক থেকে এসে এক আঘাতে তাঁর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাঁর দুই পুত্র "চানান খাঁ" ও "রতন খাঁ" কেও হত্যা করা হয়।

পাগলা রাজার মৃত্যুর পর রাণী নিজ হাতে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন। খুনীর মেয়ে বলে তাঁর খুব বদনাম হলো। পাগল রাজার অমঙ্গলী নামে এক কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল "মুলিমাথংজা"। একটা বাঁশের সিংহাসন তৈরি করে "তেইনচারা" নদীর মুখে স্থাপন করা হ'ল। ধুরাইয়া, কুড়াইয়া, ধাবানা ও পিদাভাঙ্গা চারজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ধাবানা খুব ভোরে উঠে ঐ সিংহাসন দখল করে রাজা হলেন, আর একটা কারণ হলো যে, তিনি শেষ রাজার কন্যার পুত্র ছিলেন। অমঙ্গলীর আরও একজন পুত্র ছিলেন — তাঁর নাম ছিল পিড়াভাঙ্গা।

ধাবানার পুত্র "ধারাম্যা" তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন। তারপর ধারাম্যার পুত্র "মোগল্যা" রাজা হলেন। "জুবাল খাঁ" ও "ফতেহ্ খাঁ" নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। মগদের সঙ্গে জুবাল খাঁর অনেক যুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর সেনাপতি কালু খাঁ সর্দার মুসলমান নবাবদের সঙ্গে অনেক বড় বড় যুদ্ধ করেছে। এইসব যুদ্ধে দুইটি বড় কামান দখল করা হয় এবং সেনাপতি ও রাজার ভাইয়ের নাম অনুসারে যথাক্রমে এগুলির নাম রাখা হয় কালু ও ফতে খাঁ। জুবাল খাঁ অল্প বয়সে মারা যান এবং রাজ্য শাসনের জন্য তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

সুতরাং জুবাল খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁর ভাই ফতে খাঁ রাজা হন। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে ফতে খাঁ নবাবদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ফররুখ শাহ ও মোহাম্মদ শাহ্-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিম্নভূমির বেপারীদের কে ১১ মণ তুলার বিনিময়ে ঝুম-চাষীদের সঙ্গে ব্যবসা করতে দিলেন।

ফতে খাঁর তিন পুত্র ছিল—শেরমস্ত খাঁ, রহমত খাঁ ও শেরজান খাঁ। জ্যেষ্ঠপুত্র শেরমস্ত খাঁ ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা হলেন। তার সময়ই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা 'মিঃ হেনরী ভেরেলিস্ট' নিজামপুর (ঢাকা) রাস্তা, কুকি রাজ্য, ফেনী ও সাঙ্গু দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমি চাকমা রাজার রাজ্য বলে ঘোষণা করলেন (মিঃ হাচিনসন-এর গেজেটিয়ার থেকে)।

শেরমস্ত খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন তাই শুকদেবকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন শুকদেব রাজা হলেন তখন তিনি এক বিরাট ভূখণ্ড বসবাসের উপযোগী করলেন যা এখন "তরফ শুকদেব" নামে পরিচিত। তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

রাজা ফতে খাঁর দ্বিতীয় পুত্র রহমত খাঁর এক পুত্র ছিলে। তাঁর নাম "শের দৌলত খাঁ"। শুকদেবের মৃত্যুর পর শের দৌলত খাঁ ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। শের দৌলত খাঁর রাজত্বে ইংরেজ ও চাকমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। মিঃ লেন ও মিঃ তুরমারস দুইবার আক্রমণ করে অকৃতকার্য হয়েছিলেন (মিঃ কটিনের রেভিনিউ হিস্ট্রি দ্রষ্টব্য)। জান বক্স খাঁ শের দৌলত খাঁর পুত্র। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে জান বক্স খাঁ রাজা হন।

১৭৮৩, ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে জান বক্সের যুদ্ধ হয়। তাঁর সেনাপতি ও ভগ্নীপতি রানুখাঁ দেওয়ানকে ইছামতির মুখে, সেনাপতি জানু দেওয়ানকে ধুরুং-এ এবং নারান দেওয়ানকে হাজারবাগে রাখা হয়েছিল। জান বক্স খাঁ নিজে "মহাফ্রং"-এর পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই সময় একজন গর্ভবতী নারী পালিয়ে যাবার সময় পালানোর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিল। রাজা হঠাৎ সেই কথা শুনে ফেলেছিলেন এবং তারপর ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা গিয়ে বড়লাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ৫০০ মণ তুলা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কথিত আছে যে ঘোষাল পরিবারের

নামকরা জমিদার সেই সময় রাজাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। জান বক্স খাঁর তিন পুত্র ছিল তব্বার খাঁ, জব্বার খাঁ ও দুলা।

জান বক্স খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তব্বার খাঁ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। তিনি রাজনগরে একটি "সাগর" (বিরাট দীঘি) খনন করেন। তব্বার খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জব্বার খাঁ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "ধরম বক্স খাঁ" ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। রাজা চট্টগ্রামের ভট্টাচার্য পরিবারের (পুরোহিত শ্রেণী) নিকট থেকে হিন্দু মন্ত্র গ্রহণ করে "মহারাজ ভট্টাচার্য" নাম গ্রহণ করেন। ধরম বক্স খাঁর তিন রাণী ছিল — "কালিন্দি" রাণী, "আতক" ও "হরি" রাণী। হরির এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম "মেনকা"। গোপীনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মেনকার প্রথম পুত্র হরিশচন্দ্র।

মহারাজ ধরম বক্স খানের মৃত্যুর পর মুলিমা গোত্রের সুখলাল দেওয়ানকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করা হয়। তাঁর ব্যবস্থাপনায় সন্তোষজনক কোন ফল না হওয়ায় কালিন্দি রাণী নিজের হাতে জমিদারি সংক্রান্ত বিষয়ের ভার নিলেন। বৃটিশ সরকার বার বার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও হরিশচন্দ্র সাবালক হয়েও কালিন্দি রাণীর নিকট থেকে জমিদারীর দায়িত্ব বুঝে নেন নাই। রাণীর প্রতি অগাধ ভক্তিই এই দায়িত্ব না নেওয়ার কারণ। কালিন্দি রাণী যোগ্য ও সুশাসন দ্বারা জমিদারি সম্প্রসারিত করেছিলেন। তিনি মহামুণি মন্দির নির্মাণ, বাৎসরিক মহামুণির মেলার সূত্রপাত, মহামুণি দীঘি খনন এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করে অমর হয়ে আছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যেসব সিপাহী শাস্তির ভয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল তিনি তাদেরকে ধরে সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। ১৮৭১-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে "লুসাই" অভিযানের সময় রাণী তার পৌত্র হরিশচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র রাষ্ট্রের প্রতি খুব অনুগত ছিলেন এবং খুব মূল্যবান সাহায্য করেছিলেন, যার ফলে তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হলো এবং একটি সোনার ঘড়ি ও চেন দেওয়া হলো যার মূল্য ১০০ পাউন্ড। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র 'কালিন্দী' রাণীর মৃত্যুর পর রাজা হন। সরকার তাঁকে রাজানগর ছেড়ে রাঙ্গামাটিতে প্রজাদের সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য করে। রাজার দুই রাণীর দুই পুত্র ছিল—ভুবন মোহন বড় রাণীর। রমনী মোহন ছোট রাণীর পুত্র।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর জমিদারি ও চাকমা ভূখণ্ড "কোর্ট অব ওয়ার্ডস" নিয়ে নেয়, কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ভুবন মোহন নাবালক ছিলেন। "রায় বাহাদুর কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান" চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাদের দৃঢ় হস্তে শাসন করে সুনাম অর্জন করেন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কুমার ভুবন মোহন রায় সাবালক হয়ে রাজা হন। বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর স্যার উডবার্ন তাঁকে নিম্নোক্তরূপে অভিনন্দিত করেন :

"চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা গোত্রের প্রধান হয়ে এমন এক পদবী লাভ করলেন যে পদবী অর্পণ করা এক মহা আনন্দের ব্যাপার। আপনার গোত্রের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী স্থান অধিকার করে আছে এবং আপনার সার্কেলের ব্যবস্থাপনাই বড় দায়িত্বপূর্ণ, এতে দক্ষতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয়। আপনি যুবক কিন্তু ভাল শিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, স্থানীয় অফিসারদের উপদেশ যা আপনাকে সব সময়ে দেওয়া হবে এবং এদের সাহায্যে আপনার সার্কেলের সুব্যবস্থা করতে সক্ষম হবেন ও এতে আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং লোকের সুবিধা হবে। সরকার আপনাকে ও পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য প্রধানদেরকে সবরকম সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব যাতে উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি হয়। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পাহাড়ীদের যাযাবর অভ্যাস ত্যাগ করান এবং যেখানে জমি পাওয়া যায় সেখানে আবাদ করান।"

রাঙ্গামাটি রাজবাড়ী
চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল
১৮ অক্টোবর ১৯১৯ খ্রী:

ভুবন মোহন রায়
৪৫তম চাকমা রাজ

ডি. ও নং ৪৭

রাঙ্গামাটি
রাজবাড়ী
৮.৩.৩৬

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ২২ জানুয়ারী ১৯৩৬ সালের ডি. ও. নং ৩৫২–৬৬ জি চিঠি অনুসারে কিছু লুসাই ও চাকমা গানের অনুবাদসহ পাঠালাম। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র গুহের বাঙ্গলায় লিখিত "চাকমা জাতির" ১৯শ ও ২০শ পরিচ্ছেদে অনেক গান, ঘুমপাড়ানি গান, রূপকথা যা চাকমাদের মাঝে খ্যাত আপনি পাবেন। আপনি যদি কোন বিশেষ অংশ অনুবাদ করতে চান তাহলে আমি তা করে দিয়ে খুব আনন্দিত হব। বিশ্বাস করি, এই বইটি আপনার লাইব্রেরীতে আছে—যদি না থাকে তাহলে আমি আনন্দের সাথে আপনাকে একটি ধার দিব।

আপনার অনুগত—

প্রতি : ডব্লিউ. এইচ. জে. ক্রিস্টি সাহেব,
আই. সি. এস
ডেপুটি কমিশনার,
রাঙ্গামাটি

লুসাই গানের অনুবাদ

তুযান তুঙ্গচাং চানখাং ক্রেন্দ্রা কনচিয়াংলিনি নাগল্মা জলত্রিংফাং জলত্রিং নামবামপা তান্নি হাড়াই আকামহিয়ারী হেইবাং কানচিয়ান লাই।

আজ রাতে তুমি আর আমি সুন্দরভাবে ঢাকঢোল বাজায়ে সুরা পান করলাম-- তোমার আর আমার বিচ্ছেদ হবে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?—কখন আবার আমাদের পুরুষ ও মেয়ে তারকার মত দেখা হবে? যুগ যুগ ধরে আমাদের এই মিলন থাকবে না—আজ রাতেই আমি আর তুমি সুরা পান করে নৃত্য করব। এর পর আমরা যার যার ঘরে চলে যাব।

১. হাদো লই বাদোল বাঁশ
কুচ্চ লেই ভলি
ন কানিজ বুজ্যি বাবা।
তার ডাকি দ্যং অলি।

১. তোমার হাতে বাঁশের ধনুক ধুতির খোটে গুলি। হে বয়সী ছোটখাট মানুষটি কেঁদো না কেঁদো না—আমি তোমার জন্য সাদাসিদে ঘুমপাড়ানী গান গাইব।

২. লাগেরা দুনদা চাড়া
পানি দিব কান
দুংখ্যা মা দুখত পষ্যণ
দুধু দিব বনে।

২. তামাক গাছ লাগান হয়েছে কে তাতে দৈনিক পানি দিবে? হতভাগা মা-বাপের অভাবে কে শিশুকে যত্ন করবে?

৩. ডলা পাড়ি ভাগনা
খাদি দিলব খব্না
তার পেবাদায়ে মুই
রোত দিনে গররয়র ভাবনা।

৩. আমি প্রায়ই জাগানা ফল তুলি এবং খাদির (উপর পাত্রের) মধ্যে রাখি-- রাতদিন আমার একই চিন্তা কিভাবে আমি আমার প্রেমিককে পেতে পারি।

৪. চিকন চ্যড়াত চিকন চেই
হোজে জাগব তোরে চিগন
বেই।

৪. ছোট স্রোতঃস্বিনীতে মাছ ধরার ফাঁদ পাতি, আমি তোমাকে আদর করে ডাকতে ভালবাসি।

৫. বাঁশি দিলুর মাচ্যি মুখ
গথ গরিন জিনে বেকেই পানি
ধুম।

৫. বাঁশীতে মৌমাছির মোম মালিশ করি, একটি কলসি আমার প্রিয়ার কাছে খুব ভারী।

৬. তদেক বাদন বাকে গরি
মেয়াবি পরা বেড়াদন পাল
গারি।

৬. এক ঝাঁক তোতা পাখি মুক্তভাবে উড়ছে এবং অন্যগুলি মদোন্মো-ত্ততায় আছে।

৭. ধচ্যা করি জাগাওন
উদি গেলে ভুক দানা জাগাত্তুন
তুই যদি গথ হদে মুই ক্যা
বৌ বেদুং পাড়াত্তুন।

৭. এখানে আমি শস্য মাড়াই করছি, কিন্তু হায়, জানি ভাগ্য আমার শেষ হয়ে গেছে, যদি তুমি এই গ্রামের অন্য বধূর মত সাহসী হও আমি চলে যাই না।

৮. চট্টি দোগান হেল্ গলস
স্বপনে দেলে নাদস্ গেল গনস।

৮. মনোহারীর দোকানে সৌখীন নীল রংয়ের কাচ আছে। হায়! স্বপ্নে আমাকে দেখে অভিসম্পাত করো না।

৯. জুমিন উদিল ধুপ তড়াই
স্বপনে দেগিনে বুক পোড়ায়।

৯. ঝুমভূমিতে সাদা তড়াই গাছ ; তোমাকে স্বপ্নে দেখে বুক পুড়ে যায়।

১০. ঝাগি জাল বানব বেই
আনগর গরব্ গে ও চিকন বেই
পারব বেই।

১০. আমি জালের থলে বাঁধি এই আশায় যে হে প্রিয়া, তোমাকে যেন আমি বন্ধনমুক্ত করতে পারি।

১১. ঝগি জাল সেই লাগা
আনব্ কপাল এই লেখা।

১১. জালের থলে ফাঁক হয়ে গেছে নিষ্ঠুর নিয়তি আমার! ভাগ্য তালা বন্ধ করে দিয়েছে।

১২. নিড়ির তলি মাবব্ হিব
পাসারি দোগান লবহিব
লইবে এ বারৎ ইলে
বাজি পাভে নয় কোন দিন।

১২. আমি দোকানে নিক্তি দিয়ে জিনিস ওজন করি এই আশায় যে আমার প্রিয়া একদিন তা কিনতে আসবে। যখন সে আসবে আমি তাকে আর যেতে দিব না। চির দিনের জন্য আমি তাকে রেখে দিব।

১৩. টেভা দে টেভা ধান কিনি
ডাকি ন পারব নাব দিনি।

১৩. তোমার নামে আমি ২/১ টাকার ধান কিনি, কিন্তু হে প্রিয়, তোমাকে আমি নাম ধরে ডাকতে পারি না।

১৪. হা ল্যা কুনৎ বাধা মেঘ জেইয়া জুদাদে স্বরণে এক।	১৪. দেখ! পশ্চিম দিগন্ত বিদায়ী সূর্যের দিকে বয়ে যাচ্ছে—আমাদের শরীর পৃথক হলেও আত্মা এক।
১৫. ডলা, খেইয়া, রগা, কোউ মোরে ফেলে ন যেহ্চ বউ।	১৫. লাল জামের আসলটুকুন খেয়ে আমাকে ফেলে দিসনারে বউ।
১৬. পানি খে, য়ো, পানত্তুন নিজন যেব মনগুন।	১৬. সর্বদা বিশুদ্ধ পানি পান কর ; তাহলে কখনও আমার মন থেকে মুছে যাবে না।
১৭. জুন সানে জাবি ধ্বাজাদি সুন্যৎ মারিজ আশাদি।	১৭. আমার ছোট ঝুমের জন্য মানদণ্ড উঁচু করে রাখি ; বৃথা আশায় আমাকে ধ্বংস করো না।
১৮. চ্যড়, উজাদে দোজর নায় মেইয়, চত্রাদে বচ্যর খায়।	১৮. যখন দু'টি ছোট প্রবাহ উপরে মিলিত হয় ; এক জনের প্রেমের এক বৎসর পরিপূর্ণ হয়।
১৯. দি দনি দাবা, বেঠকা, দিয়া, কুনদি ধাজনে থদক্যা।	১৯. পয়সার বুদবুদের একটা উৎস আছে কিন্তু তোমার এই পরম সৌন্দর্য কোথা থেকে পেলে?
২০. চারি লাগেই ফোরৎ লই সার পেয়া, উদিলে বেরেচ চই।	২০. আমি আমার কাস্তের সঙ্গে বেতের হাতা সংযুক্ত করি, আশা করি তোমার স্বল্প কাজের ফাঁকে আমার কাছে আসবে।

পরিশিষ্ট – ৩

স্মৃতিকথা

দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের নতুন সরকার অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. মিঃ ল্যান্স নিবলেট্‌কে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসনভার গ্রহণ করতে বললেন। এই সময়টা ছিল বড় বিভ্রান্তিকর, তখনও উপজাতিরা আনুগত্য স্বীকার করে নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পুরোপুরি সমর্থ হয় নি। পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুগত্য ও পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য মিঃ নিবলেট্‌ নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি পূর্ববর্তী ডেপুটি কমিশনারদের উত্তরাধিকারী ও "থমাস লিউইনের" নাতি হিসাবে উপজাতিদের বিশ্বাস অর্জন করলেন। হাতী শিকারের সময় ইরানের শাহের ভাইকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। পরলোকগত ডেপুটি কমিশনারের মেয়ে মিস্‌ জুন নিবলেট্‌ তাঁর বাবার চাকরি জীবনের শেষ দুই বৎসর তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর কিছু ধারণা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

পি. বি.
(P. Bessaignet)

লুসাই প্রধান (সর্দার) 'থ্যাংলিয়ানা'র আদেশে কয়েকজন লুসাই চোরাগুলি বর্ষণকারী 'থমাস লিউইন'কে হত্যা করার জন্য কয়েকবার তাঁর জীবনের উপর আক্রমণ চালায়। 'লিউইন' কোন রকমে তাদের গুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করেন এবং অবশেষে সরকারিভাবে থ্যাংলিয়ানার কর্মস্থান পরিদর্শন করতে যান।

তিনি থ্যাংলিয়ানাকে বললেন :

"আমি দেখলাম তোমার চোরাগুলি বর্ষণকারীরা বিরক্তিকর। কেন তুমি মিছামিছি তোমার অস্ত্রসম্ভার আমাকে মারার জন্য নষ্ট করছ? তুমি কি জান না যে আমি অমর? তোমার সবচেয়ে নির্ভুল লক্ষ্যভেদী লোককে ডাক, আমি তার প্রমাণ দেব।"

তার পর তিনি থ্যাংলিয়ানার হাতে তার বন্দুক ও দুইটি শক্ত সীসার বল দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। বন্দুক ও গুলি ভাল করে দেখার পর থ্যাংলিয়ানা 'লিউইনকে' তা ফেরত দিল। এদিকে লিউইন পূর্ব থেকেই এই সীসার বলের অনুকরণে দুটি মোমের বল তৈরি করে রেখেছিলেন। লুসাই যোদ্ধাদের কড়া পাহাড়ার মধ্যে একটু হাতের কায়দায় লিউইন সীসার গুলির পরিবর্তে মোমের গুলি দিয়ে বন্দুক ভরলেন।

তার পর তিনি বাছাই করা একজন লক্ষ্যভেদীর (থ্যাংলিয়ানের পুত্রদের মধ্যে একজন) হাতে বন্দুক তুলে দিলেন এবং নিজে অল্প কিছু দূরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "এখন আমাকে গুলি করে দেখ, মারতে পার কি না"। লক্ষ্যভেদী লোকটি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল এবং গুলির ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল 'থমাস লিউইন' অক্ষত অবস্থায় স্মিতহাস্যে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে সার্টের সম্মুখ হতে ধূলি ঝেড়ে ফেলছেন। তিনি সাহসের সঙ্গে বললেন, "আবার চেষ্টা কর।" আবার থ্যাংলিয়ানার পুত্র লক্ষ্য করে গুলি করলো কিন্তু একই অবস্থা হলো। এরপর উপজাতিরা বিশ্বাস করল থমাস লিউইন ঈশ্বরের মত।

—"তোমার নাম কি?" — শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্দার থ্যাংলিয়ানা জিজ্ঞাসা করল।

"টম লিউইন"—তিনি উত্তর দিলেন। থ্যাংলিয়ানা অবাক হয়ে চীৎকার করে উঠে বলল—"থ্যাংলিয়ানা আমার নামও তো তাই।"

তার পর থ্যাংলিয়ানা একটি ছাগল আনতে বলল এবং সেটাকে মেরে তার সদ্য গরম রক্ত একটা লাউয়ের খোলে ধরে প্রথমে থমাস লিউইনের কপালে তিলক পরিয়ে দিল এবং পরে সে নিজে পরল।

"আমরা এখন রক্তের ভাই"—সে ঘোষণা করল এবং তার স্ত্রী সামনে এসে তার পাইপের তলা থেকে আর্দ্র কালো তামাক বের করে লিউইনের জিহ্বায় দিল। এইটাই সর্বোচ্চ সম্মান যা উপজাতিরা তাকে দিতে পারে।

সেই দিনের পর থেকে ডেপুটি কমিশনাররা পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের কাছে "অমর প্রাণী বলে গণ্য হ'ল" এবং অবশেষে শান্তি স্থাপিত হ'ল, যা অনেক দিন পর্যন্ত চলেছিল, অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত।

১৯৪৯ সনে মাত্র দুই বৎসরে আমার বাবা পাকিস্তানের পক্ষে তাদের কেবল জয়ই করলেন না বরং তাদের হৃদয়ও অধিকার করে বসলেন এবং তারা বিশ্বাস করত আমার বাবা থমাস লিউইনের পৌত্র। সেই সময় একদিন তিনি জীপে করে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মেঠো পথে ভ্রমণ করছিলেন, তখন এই পথকে একটি সড়কে পরিণত করার চেষ্টা চলছিল। সেই রাস্তার অনেক জায়গায় ভূমি ধ্বসে পড়েছিল এবং অনেক বিপদের ঝুঁকি ছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে এমন সময় জীপ গড়িটি উল্টে গেল, বাবা তার নিচে পড়ে গেলেন এবং তিনি এক দিকের ফুসফুসে বেশ আঘাত পেলেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে বাবার সহকারী মেজর হোসেন ও ড্রাইভার খুব সামান্যই আহত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিকটস্থ একটি মগ গ্রামে যেয়ে উপস্থিত হলেন এবং সাহায্য নিলেন।

এই সময়ে আমার বাবা অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁর জ্ঞান ফিরলো। জ্ঞান ফেরার পর কয়েক মুহূর্তে তিনি ভাবলেন যে তিনি মারা গেছেন। তিনি কেবল চোখের সামনে হলুদ রশ্মি দেখতে লাগলেন এবং বহুদূর থেকে যেন ভেসে আসা স্বর্গীয় বাণীর পবিত্র ক্ষীণ ধ্বনি শুনতে লাগলেন। কিন্তু যতই আস্তে আস্তে জীবনীশক্তি পেতে লাগলেন ততই মানুষের শব্দ, মৃদু মৃদু কথা, চাপা কান্না প্রভৃতি শুনতে লাগলেন।

তিনি মুখের উপর হাত তুলে গাঁদা ফুলের পাপড়ী একপাশে সরিয়ে ফেললেন, দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পেলেন এবং দেখতে পেলেন তিনি একটি বিছানায় শুয়ে আছেন, যেটি সম্পূর্ণভাবে গাঁদা, 'ফ্রাঞ্জিপানী, হিবিসকাস প্রভৃতি ফুলে আবৃত। বিছানার চতুর্দিকে দেখতে পেলেন নিষ্পাপ মগ মেয়েদের মুখ এবং দূরে ঘরের এক কোণে একটি মেয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে।[১] সমস্ত শক্তি দিয়ে বাবা তার এক বাহুর উপর ভর করে উঠলেন এবং বুকের ব্যথায় দাঁত কড়মড় করতে লাগলেন ও যতদূর সম্ভব কঠোর স্বরে ডেকে বললেন :

"কোন্ সাহসে তোমরা মনে করলে যে আমি মরে গেছি? তোমরা কি জান না ডেপুটি কমিশনার অমর?"

সত্যি তিনি তাদের কাছে অমর হয়ে আছেন এবং চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে অনেকেই তাঁর অফিসে এলো এবং

---

১. এটা মগদের বৈশিষ্ট্য। এটা বাঁশের তৈরি কিন্তু মুখের কাছে একটা রূপার পাত আছে। কেবল অবিবাহিত তরুণী মেয়েরা এই যন্ত্র বাজাতে পারে।

তাঁর শূন্য চেয়ারের সামনে নতজানু হয়ে বসে চারিদিকের বাতাসে চুমু[২] খেল এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত তাদের সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা স্মরণ করল।

* * * * *

কোন এক সময়ে আমার বাবা ম্রো গ্রামের মধ্য দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময়ে একজন উপজাতীয় যুবক নীরবে তাঁকে মাইলের পর মাইল অনুসরণ করে চলল। অবশেষে বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার জন্য তিনি কিছু করতে পারেন কিনা। ম্রো যুবকটি নিকটে এসে বাবার জামা তুলে বুকের উপরের চামড়ায় চিমটি কেটে বলল,"এইটা আমি চাই।" বাবা উত্তর দিলেন — "ঠিক আছে। আমি তো আমার চামড়া দিতে পারি না তবে এর সবচেয়ে নিকটতম জিনিসটি তোমাকে দেব।" এই কথা বলে তিনি জামা ও গেঞ্জী খুলে ফেললেন এবং গেঞ্জীটি যুবককে দিয়ে দিলেন। সে গেঞ্জীটি গায়ে দিল এবং উৎসাহের সঙ্গে বাবার থার্মোফ্লাস্ক বয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। এতক্ষণ পর্যন্ত সে যে বাঁশীটি সঙ্গে করে রেখেছিল এখন তা ঠোঁটে পুরে মনোরম সুরে বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে চলল। এইভাবে সে বাঁশী বাজাতে বাজাতে, গান করতে করতে,নাচতে নাচতে বাবার আগমনবার্তা বিভিন্ন গ্রামে ঘোষণা করতে লাগল এবং তার গানের প্রধান ধুয়া ছিল — "ফালান গিরি লাচ্‌রে, লাহ্‌রে ...." অর্থাৎ "সেই মহান মানুষটি আসিতেছে আসিতেছে ....।"

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমার বাবা রাঙ্গামাটি অফিসে বসে কাজ করছিলেন। সেই সময় একজন সাহসী ম্রো যুবক অন্যান্য দর্শন-প্রার্থীর সঙ্গে বাইরে অপেক্ষা করছিল। যখন তার পালা এলো, সে সোজা বাবার সামনে গিয়ে একটা বন্দুকের লাইসেন্স চাইল।

বাবা বললেন—"তোমার অনেক দেরী হয়ে গেছে। তোমার মৌজার নির্দিষ্ট সংখ্যক লাইসেন্স দেওয়া হয়ে গেছে।" "আপনি আমাকে অস্বীকার করতে পারেন না" বলে সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং বলল — "আমি যা চাইব তাই আপনি আমাকে দিতে বাধ্য থাকবেন কেননা আমি এটা পরিধান করে আছি।" এই বলে সে তার পরিহিত গেঞ্জীটি দেখাল। আর বলল "আপনি এটি আমার চাচাতো ভাইকে দিয়েছিলেন ....।" তখন আমার বাবা গানের মাধ্যমে আগমনবার্তা ঘোষণার কথা স্মরণ করলেন এবং হেসে উত্তর দিলেন,

"ও হাঁ, অবশ্যই, তুমি যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব।"

---

২. "মগী" কায়দায় চুমু খাওয়া হ'ল একে অপরে চামড়ার গন্ধ শোঁকা অর্থাৎ একে অপরের গন্ধ শোঁকে।

সুতরাং সাহসী ম্রো যুবকটি তার বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে খুব খুশী হ'ল এবং সে এর বেশি কিছু আশা করে নি।

* * * * *

একদা এক চাকমা মেয়ে ও চাকমা ছেলে একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসত। মেয়েটির বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজন এই ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে না পেরে ১৫ মাইল দূরবর্তী এক গ্রামের এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে এবং মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য করে। কিন্তু প্রথম রাত্রেই সে তার নতুন স্বামীর বাড়ি থেকে পলায়ন করে। সে সমস্ত রাত্রি গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আসে, যে জঙ্গলটিতে বন্য হাতী, বাঘ ও বিষধর সাপের মত বিভিন্ন বন্য জীবজন্তু বাস করতো। পরের দিন সকালে সে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে তার প্রেমিকের বাড়ি পৌঁছিল এবং তার (মেয়ের) পরিবারের অনুমতি নিয়ে তার প্রেমিককে বিয়ে করল। মেয়েটি বলল "যে মানুষকে ভালবাসতে পারব না তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার থেকে জঙ্গলে যে কোন প্রকার মৃত্যু আমার কাছে এমন কিছু খারাপ হতো না।" এ রকম আদর্শবাদী আবেগ চাকমাদের মধ্যে বিরল নয়।

তারা খুব অহঙ্কারী সেইজন্য সহজে তারা মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। মনের দিক থেকে তারা খুব ভাবপ্রবণ এবং যখন ভয় দেখান হয় বা রাগান্বিত হয় তখন আবেগের যে কোন চরম অবস্থা প্রদর্শন করে।

* * * * *

পাহাড়িয়া উপজাতিদের মধ্যে মগেরা সবচেয়ে কম সংরক্ষণশীল এবং সবচেয়ে বেশি প্রতিপাদক। এদের মেয়েরা গর্বিতা কেননা তারাই পরিবারের কর্ত্রী এবং কর্মী। যেকোন ব্যক্তি যেকোন সময়ে মগ পরিবারে ঢুকতে পারে এবং যতক্ষণ সে থাকতে চায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে থাকতে পারে এবং তাকে খাওয়ানো ও তার আরামের ব্যবস্থা করা হয়। ভীরু ও দ্রুত পথচারীদের জন্য তারা দৈনিক রাস্তার পাশে বাঁশের চালের ছায়াতে বড় এক কলসি পানি রেখে আসে। মগেরা কেবল একটা পাপের কথাই জানে, সেটা হলো পরোপকারের বিরোধী হওয়া।

যৌন ব্যাপারে তারা খুব বাস্তববাদী এবং এ ব্যাপারে তারা জটিলতা-শূন্য দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কোন কোন গ্রামে "অবিবাহিতের ঘর" (Bachelor houses) আছে। সেখানে পাণিপ্রার্থী যুগল বিয়েকে পরীক্ষামূলকভাবে দেখার জন্য কিছু সময় একত্রে বাস করে। যেসব গ্রামে অবিবাহিতের ঘর নাই সেখানে ছেলেমেয়েদেরকে স্বাধীনভাবে

মেলামেশা করতে দেওয়া হয়। এসব ব্যাপারে একটি মাত্র নিয়মই আছে, তা হ'ল যদি কোন মেয়ে অন্তঃস্বত্তা হয় তবে যে ছেলে এর জন্য দায়ী তাকে অবশ্যই সেই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। এটা তাদের কাছে অসম্মানজনক কিছু নয় বরং খুব স্বাভাবিক এবং সাধারণ অবস্থা। বিয়ের পর তারা একে অন্যের প্রতি খুবই বিশ্বাসী। যদি কোন কারণে বিয়ে স্থায়ী না হয় তবে অতি সহজে আপোষের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের পুনর্বিবাহে দুই নতুন পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় থাকে। প্রথম বিয়ের পক্ষের একটু বড় ছেলেমেয়েরা বাবা বা মায়ের সঙ্গে অথবা পালাক্রমে উভয়ের সঙ্গেই থাকতে পারে।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

যেমন স্কটিশদের 'হুইস্কি', জার্মানদের 'বিয়ার', ফরাসীদের 'ওয়াইন' তেমনি পাহাড়িয়াদের মদ[৩] অবশ্যই চাই। একজন বৃদ্ধ লোকের মদের খুব নেশা ছিল, সে দৈনিক কমপক্ষে এক বোতল করে মদ খেতো। সে তার ছেলেকে বল্ল :

"আমি যখন মরে যাব তখন আমাকে যেন একটা বাঁশের নল মুখে দিয়ে কবরস্থ করা হয়, যে নলের মুখ মাটির উপরিভাগে থাকবে এবং তুমি দৈনিক তাতে এক বোতল করে মদ ঢেলে দেবে।"—এটা অবশ্য রসিকতার কথা।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

পাহাড়িয়া লোকেরা ভীতিকারক ও দুঃখদায়ক শাসকের থেকে ভাল ও সহানুভূতিশীল মানুষের কথাতেই বেশি সাড়া দেয়। এর কারণ হ'ল এই যে, সে নিজেও সম্পূর্ণ সৎ ও সরল তাই মানুষের মূল্যও সে সেভাবেই বোঝে। নির্ভীক, গর্বিত ও সৎব্যক্তি চুরি করা, ভিক্ষা করা, মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আমার বাবা এক সময়ে পাহাড়িয়াদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

> "—আমরা নীতিসমূহ সূত্র হিসাবে ধরে নেই ;
> কিন্তু তারা সেগুলি কার্যে প্রতিফলন করে।"

একদিন আমি ও বাবা এই জেলাতে পরিদর্শন শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাঙ্গামাটি থেকে ১৪ মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে থামলাম। সেখানে বাবার কাজ শেষ হওয়ার পর এবং

---

৩. ভাতের তৈরি এক রকম সুরা বিশেষ।

লোকদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করার পর আমরা আবার জীপ গাড়িতে উঠে রওনা হলাম। ছয় মাইল অতিক্রম করে আসার পর লক্ষ্য করলাম আমার হাতব্যাগটি নাই-- তখন স্মরণ হ'ল যে আমরা যখন ঐ গ্রামে ছিলাম তখন জীপ গাড়ির চাকার উপরের আবরণের উপর রেখেছিলাম এবং পরে গাড়ি চালিয়ে আসার সময় সেটি নিশ্চয়ই পড়ে গেছে। ব্যাগটির মধ্যে ৬৪টি টাকা ও কিছু প্রসাধন সামগ্রী ছিল। আমরা ঘুরে আবার গ্রামের দিকে চলতে শুরু করলাম এবং গ্রামটি থেকে দুই মাইল আগেই দেখতে পেলাম একজন চাকমা যুবক আমার চামড়ার বাদামী রঙ–এর হাতব্যাগটি নিয়ে আসছে। যদি আমরা ভুলে ফিরে না যেতাম তাহলে সে ২০ (বিশ) মাইল পথ পায়ে হেঁটে রাঙ্গামাটিতে উপস্থিত হয়ে এটা আমাকে দিত। অবশ্য আমি ভালভাবেই জানি যে এর মধ্যে থেকে কিছুই সরান হয় নাই এবং এমন কি এটা খোলাও পর্যন্ত হয় নাই।

আমরা আগে থেকেই জানতাম যে কোন পাহাড়িয়াকে পরোপকারিতা বা সাহায্যের বিনিময়ে কখনও টাকা পয়সা দিতে নাই, কারণ এতে তারা খুব অপমাণিত বোধ করে। দুই–একবার আমি যখন বিদেশীদের সঙ্গে ছিলাম তখন তাদের জীপগাড়ি বন্ধ হলে পথচারী পাহাড়িয়াদের সাহায্যে তা ঠেলতে হয়েছিল। তাদের এই কষ্টের বিনিময়ে বিদেশীরা যখন টাকা দিতে চাইল তখন তারা অত্যন্ত বিব্রতবোধ করল এবং তা নিতে অস্বীকার করল।

মোটর গাড়িতে যাতায়াত তখনও তাদের কাছে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বস্তু ছিল। পূর্ববর্তী ডেপুটি কমিশনাররা যাতায়াতের জন্য ঘোড়া, নৌকা ব্যবহার করতেন অথবা হেঁটেই যেতেন। পার্বত্য অঞ্চলে প্রথম দিকে আমার বাবা যেখানে সম্ভব সেখানে বাইসাইকেল ব্যবহার করতেন এবং ছোট ছোট ছেলেদেরকে তার সাইকেলের হাতলে বা পেছনে বসিয়ে তাদের আনন্দ দিতেন। এমন কি সাইকেলও তাদের নিকট বেশ নতুন ছিল।

আমার বাবাকে যখন সরকারি জীপ গাড়ি দেওয়া হ'ল তখন তিনি প্রায়ই পাহাড়িয়াদের গাড়িতে তুলে পৌঁছে দিতেন এবং এতে তারা এত পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হতো যে সারা পথ ধরে তারা অকারণ বক্‌বক্ করতো ও হাসতো। হৃদ্যতাপূর্ণভাবে বাবা তাদেরকে সিগারেট বা পানীয় দিতেন এবং তারাও সেভাবে তা গ্রহণ করতো। গন্তব্যস্থান যদি তাদের বাড়ি হ'তো তা'হলে তারা সব সময়ই আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতো। তাদের অনুসরণ করে আমরা বাঁশের পুল পার হয়ে, খাড়া পাহাড়ি পথ বেয়ে, খাঁজকাটা গাছের কাণ্ড বেয়ে, বাঁশের মাদুর দিয়ে ঘেরা চত্বরে প্রবেশ করতাম। আমরা আমাদের পা ধুয়ে

ঘেরা—দেওয়া বারান্দার মেঝেতে বাঁশের নরম মাদুরের উপর গড়াগড়ি দিতাম, তাদের 'হুঁকা'তে কয়েকটা টান দিতাম, মদ খেতাম বা পান চিবাতাম অথবা কেবল তাদের সঙ্গই উপভোগ করতাম। আমরা তাদেরকে পুঁতি, মাথার তেল, চিরুনি প্রভৃতি উপহার দিতাম এবং সেগুলি তারা নিত কিন্তু টাকা পয়সা কখনও নিত না।

১৯৫৬ সনের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বাবাকে কিছু চাল উপজাতিদের মধ্যে বিতরণ করতে দেন, কিন্তু সে চাল তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অল্প ছিল। পাহাড়িয়ারা খুব আত্মসম্ভ্রমী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী কাজেই তারা কখনও এসে সাহায্য চাইবে না তাই বাবা সেগুলি নিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে গেলেন। সেই সঙ্কটময় সময়ের শেষের দিকে তারা বাবার কাছে আসতে শুরু করল কিন্তু সবাইকে দেওয়ার মত পর্যাপ্ত চাল ছিল না ; তখন বাবা তাদেরকে আমাদের বাগানের ফলমূল, আমেরিকান রেডক্রসের কাপড়—যেগুলির বিনিময়ে পরে তারা বাজার থেকে চাল পেয়েছিল ; এবং বাবা নিজের পকেট থেকে তাদেরকে টাকা দিতেন। এই প্রচণ্ড অভাবের সময়েও তারা কোন রকম দয়া-দাক্ষিণ্য নিতে অপছন্দ করত। সেইসব দিনগুলিতে বাবাকে দেখতাম টেবিলের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন বা দেখতাম সেই সাথে নীরবে চোখের জল তার গণ্ডদেশ বেয়ে পড়ছে,—সেইসব মানুষের জন্য যাদের তিনি এত ভালবাসতেন এবং যাদের দুঃখ কষ্ট তিনি অনুভব করতেন কিন্তু তাদের বাঁচার জন্য এমন কিছু করতে পারছেন না ভেবে। নির্ঝঞ্ঝাট, সুখী, গর্বিত পাহাড়িয়ারা অবশেষে সভ্যতার আস্বাদন নিতে শুরু করল।

* * * * *

আমার বাবার মৃত্যুর দুই-একদিন পর একজন বৃদ্ধ চাকমা ভদ্রলোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের চাল ও মদের দরকার আছে কিনা, থাকলে, সে আনন্দের সাথে আমাদের তা দিতে পারে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে আমাদের এখনও পর্যাপ্ত আছে। সেই তাই বলে আমাদর উপর নজর রাখা বাদ দেয় নি। শহরের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠের মত সেও এসে প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক সময় চুপচাপ বসে থেকে যেতো। প্রায় কিছুদিন পর পরই সে তার সদিচ্ছাপূর্ণ খোঁজখবর নিত ও সাহায্যের পূর্ণ আশ্বাস দিত।

টীকা

যখন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক মারা যায় তখন তার পেট থেকে ভ্রূণ কেটে বের করে আলাদাভাবে পোড়ান বা কবর দেওয়া হয়।

পাহাড়িয়াদের মধ্যে যমজ সন্তান দেখা যায় না কেননা তাদেরকে অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়। সুতরাং যখন কোন স্ত্রীলোক যমজ সন্তানের জন্ম দেয় তখন সে অবহেলা করে একজনকে মরতে দেয়।

পাহাড়িয়ারা দুধ খায় না কেননা তারা মনে করে যে গো-শাবককে তার মার দুধ থেকে বঞ্চিত করা পাপ। তারা বলে, "যদি আমরা গো-শাবকের দুধ চুরি করি তবে ঈশ্বর আমাদের সন্তান তুলে নিয়ে শাস্তি দিতে পারেন।"

যখন কোন পাহাড়িয়া পরিবারকে ভোজ, পুনিয়া উৎসব, বাজার প্রভৃতিতে যাওয়ার সময় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তখন অশুভ শক্তির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের সন্তানদেরকে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির ছদ্মবেশে নিয়ে যায়।

ম্রোরা বিশেষ কোন ধর্মের অনুসারী নয়। কথিত আছে যে, অনেক দিন আগে তারা ঈশ্বরের কাছে কতকগুলি "পথ নির্দেশক নীতি" চেয়ে পাঠাল। ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং তাদের জন্য এক পবিত্র গ্রন্থ পাঠালেন। গ্রন্থটি খুব বড় ও ভারী ছিল, তাই ঈশ্বর একষাঁড়কে ঠিক করলেন গ্রন্থটি তাদের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যা হোক ষাঁড়ের মত একটা নির্বোধ প্রাণীকে তো আর পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং ঈশ্বর একটা কুকুরকেও ঠিক করলেন ষাঁড়কে স্বর্গ থেকে মর্ত্যের রাস্তা দেখানোর জন্য।

ষাঁড় ও কুকুর অনেক দিন ধরে পথ চলল এবং অর্ধেক রাস্তা আসার পর তারা বিশ্রাম গ্রহণের জন্য থামল। দীর্ঘদিন পথ চলার ফলে তারা যে কেবল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তাই নয়,তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্তও হয়ে পড়েছিল। তারা কোথাও কোন খাদ্যের সন্ধান পেল না। অবশেষে ষাঁড়টি আর লোভ সংবরণ করতে না পেরে পবিত্র গ্রন্থটিই গিলে ফেলল।

ষাঁড়ের এই আচরণে ঈশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তার নিচের পার্টির সব কটি দাঁত উৎপাটন করে তাকে শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই আজ অবধি ষাঁড়ের নিচের পাটিতে কোন দাঁত নেই এবং তার পাকস্থলী ফাড়া হলে লক্ষ্য করা যাবে যে এর অভ্যন্তরে রয়েছে পবিত্র গ্রন্থের পাতা।

যখন কোন ম্রো মারা যায় তখন তার প্রিয় কুকুরটিকেও মেরে ফেলা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে কুকুরটি মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

(Anonymous), *Tipera and Chittagong Kukis,* Indian Antiquary, 1872, pp. 222-226.

Barbe. *Some Account of the Hill Tribes in the interior of the District of Chittagong, in a letter to the Secretary of the Asiatic Society.* Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 14, p.t.l. 1845, pp. 380-391.

Basu, P. C. *The Social and Religious Ceremonies of the Chakmas,* Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, n, s. 27, 1931, pp. 213-223.

Bernot, Lucien, *In the Chittagong Hill Tracts,* Pakistan Quarterly, (3), 1953, pp. 17-61.

Quelques aspects de la vie sociale des Mogh du Pakistan oriental. Compte-rendus des seances de I.' I. F. A., 7 eme fascicule, december 1953.

Bernot Lucien et Bernot Denise, *Chittagong Hill Tribes,* in *Pakistan Society and Culture,* by Stanely Maron, Human Relations Area Files, New Haven 1957.

Les Khyang des Collines de Chittagong, Plon, Paris 1958.

Bhattacharyya, Rajendra Kumar abd Mitra, Sarat Chandra. *On some Rain-compelling and Rain-stopping Rites from the District of Chittagong in East Bengal.* Journal of Anthropological Society, Bombay, 13, 1925, pp. 342-362.

Blochmann, H. *On a new King of Bengal (Alluddin Firoz Shah), and notes on the Hussaini Kings of Bengal and their Conquest of Chatgaon (Chittagong),* Journal of the Royal Asiatic *Society* of Bengal, 41, pt. I, 1872, pp. 331-340.

Bu San Shwe. *The Arakan Mug Battalion,* Journal of Burma Research Society, 13, 1923, pp. 129-135.

Bukhari, Farigh. *Azad Qabayel Ka Nizam-i-Mu'asha rat.* Sayyiara, Karachi (9. Oct. 1953. pp. 27-29).

Chandra Baduya, S. R. *Chattagramer Mager Itihas,* Calcutta, 1906.

Dalton. *Descriptive Ethnology of Bengal.* Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1872.

Das Gupta, D. C. *Naturvolkers of Chittagong Hill Tracts,* Calcutta Geographical Review, Vol. 3, September 1940, pp. 24-35.

Embree, J. F., and Dotson, L. O. *Bibliography of the Peoples and Cultures of Mainland South East Asia.* New Haven. 1950.

Ghani, Q. *Chittagong Hill Tracts.* Pakistan Quarterly, 1(5), 1950-1951,pp. 63-68.

Ghosh, S. C. *Chakma Jati.*

Hunter. W. W. *A Statistical Account of Bengal.* Trubner, London, 1876.

Hyder Husain. *Chittagong Hill Tracts : Land, People and its Problem.* in Pakistan To Day, Dacca, 6 (5), May 1953, pp. 203-208.

Hutchinson, R. H. *Chittagong Hill Tracts, District Gazetteer,* Calcutta 1909.

Kauffmann, *Less Megalites de la region des Mro au Pakistan oriental.* Cinquième congres des sciences anthropologiques et ethnologiques, Philadelphie, 1956.

Konow, S. *Notes on the Maghi dialects of the Chittagong Hill Tracts.* Zeitschrif Deustsch Morg Geselles, Bd LVII, Hft I, 1903, pp. 1-12.

Levi-Strauss. *Miscellaneous Notes on the Kuri of the Chittagong Hill Tracts, Pakistan* in Man, Dec. 1951, pp. 283-284. *Le syncretisme religieux d'un village Mog.* in Revue d' Histoire des Religions, 1951. pp. 202-237.

Kinship Systems of three Chittagong Hill Tribes, in South-wester Journal of Anthropology, vol. 8, No. 1. Spring 1952, pp. 40-50.

Lewin,Capt. T. H. *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein.* Calcutta 1869.

Wild Races of South Eastern India. Allen, London 1870. *Hill Proverbs of the inhabitants of the Chittagong Hill Tracts* Calcutta, 1873.

A Fly on the Wheel, London, 1885.

Mills, J. P. *Notes on a Tour in the Chittagong Hill Tracts* in 1926. Census of India, 1931.

Nafis Ahmad and Rizvi, A. I. H. *Need for the Development of Chittagong Hill Tracts.* Pakistan Geographical Review, Lahore, 1951, 6(2), pp. 19-29.

Nafis Ahmad, *The Pattern of Rural Settlement in East Pakistan.* in Geographical Review, New York, Vol. XLVI, No. 3. 1956. pp. 388-398.

O' Malley, L. S. S. *Chittagong District Gazetteer.* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908.

Pandit, Prannat. *Note on the Chittagong Copper Plate dated S'aka 1165, or A. D, 1243, presented to the Society by A. L. Clay.*

Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 43, pt. I, 1874, pp. 318-324.

Pargiter. *Notes on the Chittagong Dialect.* Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal. 55, 1886, pt. I. pp. 66-80.

Rahman, H. *Chittagong since Partition.* Pakistan Economic Journal, Karachi, 1(3), January 1950, pp. 65-81.

Riebeck, E. *The Chittagong Hill Tribes. Results of a Journey made in the Year* 1882. Asher, London, 1885.

Risley. *The Tribes and Castes of Bengal.* Calcutta, 1891.

Rivi, A. I. H. *Agricultural Proproblems of the Chittagong Hill Tracts.* Pakistan Business New Views, 1(3), February 1952, pp. 18-19.

fer, R. The *Linguistic Relationship of Msu, Traces of a lost Thibeto-Burmese Language.* Journal of Burma Research Society, 31, 1941, pp. 58-79.

*   *   *   *   *

Census of India, 1901. Summary of Measurements of Mongoloid, Types of Eastern Himalaya, Chittagong Hill Tracts and Assam, Vol. I. India Ethnographic Appendices, pp. 34-35.

Chittagong Hill Tracts Manual, Government of Bengal Board of Revenue. Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1942.

Selections from the Correspondance on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts, 1862-1927. Government of Bengal, Revenue Department, Government of Bengal Press, Calcutta, 1929.

Selections from the Correspondance on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts. Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1887.